বসন্ত পথিক

১

বিন্দু, নামটি শোনা মাত্রই মৃদুলের ভেতরটা যেন মোচড় দিয়ে উঠলো। তিন বছর পর বিন্দুর ফোন! এতোদিন পর, ও কি চায়? মনের ভেতর কেমন একটা তোলপাড় টের পেল মৃদুল। মলির কাছ থেকে বিন্দুর নাম শোনার পর থেকেই ওর অনুভবে বেদনার মিহিন বেহাগ সুর ছড়াতে লাগলো। কিন্তু এমন হবার কথা ছিল না। বিন্দু ওর কাছে এখন বিস্মৃত এক নাম, কষ্টের পাথরে চাপা এক টুকরো আবেগ কিংবা ফেলে আসা সময়ের বাঁকে এক সোনালী ফাঁস। মৃদুলের চিন্তায় কৌতুহলের রেখাপাত সৃষ্টি হলো।

মলি ফের বললো,

'ছোটদা, তোমার খোঁজে কাল রাতে ওই ভদ্র মহিলা কয়েকবার ফোন করেছিলেন। তিনি তোমার মোবাইল ফোনের নম্বর চাইছিলেন। আমি একবার ভেবেছিলাম, তোমার মোবাইল ফোনের নম্বর তাকে দিয়ে দিই। আবার তোমার নিষেধের কথা মনে হতেই তাকে নম্বর দিইনি। তবে তার কথায় মনে হলো ভদ্র মহিলার তোমাকে খুব প্রয়োজন।'

এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বললো মলি। গুরুত্বপূর্ণ কথা বলে ফেলে ভারমুক্ত হলো যেন ও। মৃদুল আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দাড়ি কামাচ্ছিলো। মলির কথা শুনে দাড়ি কামানোর কাজে ও মনযোগ দিতে পারলো না। মলি কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললো,

'ছোটদা, ওই ভদ্র মহিলা আবার ফোন করলে তোমার মোবাইল ফোনের নম্বর দেবো?'

এর জবাবে মৃদুলের রাগত সুরে 'না' বলাটাই উচিত। কিন্তু ও না বলতে পারছে না। মন সায় দিচ্ছে না। ও ভাবলো, কী বলবে। ওর মধ্যে পুরানো এক কাঁপন ঝাঁকুনি দিয়ে উঠলো। এ কাঁপনে আগে ও শিহরিত হতো। কিন্তু এখন শিহরিত হবার কিছু নেই। অপ্রত্যাশিত এই কাঁপনটা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দেবার চেষ্টা করতে করতে মৃদুল আয়নায় নিজের দিকে তাকালো। আয়নায় তাকিয়ে নিজের প্রতিবিম্বটা ও দেখতে পেল না। অন্যমনস্কভাবে দাড়ি কামাতে গিয়ে গালের উপর চলমান রেজারটা হাতের সামান্য কাঁপুনিতে আলতো কামড় বসালো। রক্ত বেরিয়ে এলো সামান্য। মৃদুলের তা নিয়ে ভ্রুক্ষেপ নেই। মলি ককিয়ে ওঠলো,

'ছোটদা, তোমার গাল কেটে রক্ত বের হচ্ছে!'

'ও কিছু নয়। এখুনি লোশন লাগিয়ে নিচ্ছি, ঠিক হয়ে যাবে। '

মৃদুল হাত বাড়িয়ে টেবিল থেকে ওল্ড স্পাইস এর বোতলটা টেনে নিল। বোতল খুলে ও গালের কেটে যাওয়া অংশে লোশন লাগালো। মনে মনে বললো, 'বিন্দু, এতোদিন পরে তুমি আবার রক্ত ঝরাতে এসেছো!' মলি কৌতুহলী গলায় প্রশ্ন করলো,

'ছোটদা, তুমি ওই মহিলাকে চিনো?'

মৃদুল এ প্রশ্নটার জবাবে তাৎক্ষণিকভাবে মলিকে কী বলবে, তা-ও ভেবে ঠিক করতে পারল না। এ মুহূর্তে ও কেমন গুলিয়ে ফেলছে। ও ভাবতে লাগলো কী বলা যায় মলিকে। মৃদুলের নীরবতা দেখে মলি ফের বললো,
‘বললে না যে, ওই মহিলাকে তুমি চেনো কিনা?’
‘ঠিক মনে করতে পারছিনা। তবে নামটি পরিচিত মনে হচ্ছে। আচ্ছা, ভদ্র মহিলা আর কী বলেছে রে?’
‘কিছুই তো বলেননি। শুধু বললেন, ‘তোমাকে তার জরুরি দরকার।’
‘ঠিক আছে, তুই এখন যা।’
‘তিনি আবার ফোন করলে কি তাকে, তোমার মোবাইল ফোনের নম্বরটা দেবো?’
‘তোর ইচ্ছে হলে দিস। আর হ্যাঁ, মা কি ফোন ধরেছিলো?’
‘না ছোটদা, মা ফোন ধরেননি। ভাবীও ধরেননি।’
মলি অতিরিক্ত তথ্য জানিয়ে দিল। মলি ওর পাশে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো। ও অকারণে মৃদুলের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে না। মৃদুল বুঝতে পারলো মলি কিছু চাইবে ওর কাছে। এক ধরনের সঙ্কোচ ফুটে উঠেছে মলির চোখে-মুখে। মৃদুল বললো,
‘তুই কি আর কিছু বলবি?’
এ কথায় হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো মলি। বললো,
‘আমাদের কলেজ থেকে একটি সাহিত্য পত্রিকা বের হচ্ছে।’
এটুকু বলে মলি চুপ মেরে যায়। মৃদুল আয়না থেকে মুখ ফিরিয়ে মলির দিকে তাকিয়ে বললো,
‘তাতে কি? সব কলেজ থেকেই প্রতি বছর সাহিত্য পত্রিকা বের করা হয়। তোদের কলেজ থেকেও না হয় একটা সাহিত্য পত্রিকা নামক কিছু বের হবে। এর মধ্যে নতুনত্ব কি আছে?’
‘না, বলছিলাম কি, আমি এই সাহিত্য পত্রিকায় একটা গল্প দেব।’
এ কথা বলেই মলি সঙ্কোচে জড়িয়ে গেল।
‘গল্প! তুই লিখবি!’
বিস্ময়ের রেশ ছড়িয়েই মৃদুল হো-হো করে অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো। ওর হাসি যেন থামতে চায় না।
মৃদুলের হাসিকে উপেক্ষা করে মলি বললো,
‘ছোটদা, আমি একটা গল্প লিখে ফেলেছি!’
‘তুই গল্প লিখেছিস? বলিস কি!’
‘হ্যাঁ, ভুলে যেও না আমি লেখক মৃদুল রায়হানের বোন।’
‘গল্প লিখতে হলে অনেক ঘুরতে হয়। অনেক রকম অভিজ্ঞতা অর্জন না করলে ভালো গল্প লেখা যায় না। আর তুই কিনা ঘরে বসেই গল্প লিখে ফেলেছিস! তুই মৃদুল রায়হানের বোন বলেই গল্প লিখে ফেলতে পারিস!’
‘ছোটদা! তুমি যে কী!’

‘আহা, তুই খেপছিস কেন? আচ্ছা, গল্প না হয় লিখলি। এখন আমার কাছে তোর বায়নাটা কি, বল।’

‘আমার গল্পটা তুমি দেখে ঠিক করে দেবে। মানে রি-রাইট করে দেবে। তারপর আমি গল্পটা কলেজের ম্যাগাজিনে দেব।’

‘আচ্ছা, দেখে দেব যা। তবে লেখাপড়া ফেলে বেশি গল্প লিখিস না, কিন্তু!’

‘ঠিক আছে। ছোটদা, আমি তোমার জন্য চা বানিয়ে আনছি।’

বলেই মলি মৃদুলের রুম থেকে চলে গেল। মলি চলে যেতেই মৃদুলের মনে বিন্দুকে নিয়ে কৌতুহলটা মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো। আজ এতোদিন পর বিন্দু কেন ওকে ফোন করলো- এই প্রশ্নটা ওকে ছোবল মারতে লাগলো। একটা সময় ছিল, যখন বিন্দুর নাম শুনলেই মৃদুলের ভেতরে কেমন উথাল-পাতাল ঢেউ তুলতো। বিন্দুর সামনে দাঁড়িয়ে এক ধরনের আবিষ্টতায় বুঁদ হয়ে যেত। বিন্দুকে কেন্দ্র করে ও স্বপ্নের বৃত্ত রচনা করতো যখন-তখন। বিন্দুও মৃদুলকে টেনে নিয়ে যেত আবেগের ডুব সাঁতারে, সম্মোহনের নিরেট নৈসর্গে। ভালোলাগার কাঁচা রঙে মৃদুল কেবল ছবি এঁকে যেত। ওড়াত স্বপ্নের ফানুস। আর বিন্দু রহস্যের মায়াজাল ছড়িয়ে মৃদুলকে যেন হাত ধরে টেনে নিয়ে যেত স্বপ্নালোকে, ভালোবাসার খেয়ালি আকাশে। অন্ধ যেমন অবলম্বন নিয়ে পথে নামে, মৃদুলও সেরকম নেমেছিলো বিন্দুকে ধরে। ভালোলাগাটা ‘ভালোবাসা’র পেখম ছড়াতে চেয়েছিলো। ঠিক তখনই বিন্দুই একদিন মৃদুলের চোখের সামনে আরেকজনকে ভালোবেসে হুট করে বিয়ে করে ফেললো। এ যেন অন্ধকে সাঁকোর মাঝখানে নিয়ে গিয়ে নিষ্ঠুর পরিহাসে ছেড়ে দেয়া। মৃদুলের স্বপ্নটা জমে ওঠার আগেই সব ভেঙে খান-খান! বিন্দুর সাথে মৃদুলের সম্পর্কটা যে করুণ রহস্যে পরিণত হবে, তা ও কল্পনাও করতে পারেনি। ধনীর সুন্দরী মেয়ের খেয়ালিপনাকে অবাক চোখে দেখলো মৃদুল। বিন্দু নিঃসঙ্কোচ চিত্তে ওর চোখের সামনে দিয়ে চলে গেল অন্যের ঘরে। বুক ভাঙ্গা বেদনা চেপে রাখলো মৃদুল। এ বেদনার কথা কাউকেই ও বলতে পারেনি, বলা যায়ও না। মানুষের জীবনে ব্যর্থতার গানি বা অপমানের লজ্জা বিষফোঁড়ার মত থাকে। এর মুখটা দেখা যায় না, কিন্তু এর অস্তিত্ব অনেক গভীর এবং বেদনাও ভীষণ তীব্র। বিন্দুর প্রতি মৃদুলের ভালোলাগার কথা, কিংবা না পাওয়ার বেদনা যখন বিস্মৃত হবার পথে, তখনই হঠাৎ বিন্দুর ফোনের খবর মৃদুলকে টেনে নিয়ে গেল সেই অধ্যায়ে। মৃদুল অনেক চেষ্টা করলো বিন্দুর কথা ভুলে যেতে। কিন্তু মনে কাঁটার মতো বিঁধে রইলো ও। স্মৃতির সেলুলয়েডের ফিতায় ভেসে উঠলো বিন্দুকে ঘিরে এক টুকরো অতীত।

নারায়ণগঞ্জের সরকারি মহিলা কলেজ মিলনায়তনে বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রের সাহিত্য আসরে মৃদুলের সাথে বিন্দুর প্রথম পরিচয়। মৃদুল ওই সভায় নিজের লেখা একটি কবিতা পাঠ করেছিলো। অনুষ্ঠান শেষে ফেরার সময় কলেজের বারান্দায় বিন্দু মৃদুলের সামনে এসে দাঁড়ালো। অকপটে বললো,

‘আমার নাম বিন্দু। আপনার কবিতাটি আমার খুব ভালো লেগেছে।’

‘ধন্যবাদ।’
জবাবে বললো মৃদুল। ও লক্ষ্য করলো মেয়েটি সপ্রতিভ এবং সাহসী। কিছু মেয়ে আছে, যাদের চট করে দেখেই বুঝা যায় তারা ভীতু ও লাজুক। আবার কাউকে এক ঝলক দেখেই বুঝা যায় সে সাহসী। বিন্দুর কথার মধ্যেই সাহসের ছবি দেখতে পায় মৃদুল। বিন্দু বললো,
‘আচ্ছা, আপনি বিরহের কবিতা বেশি লেখেন কেনো? আপনার গল্পগুলোও দুঃখ ভারাক্রান্ত। আপনি কী দুঃখ বিলাসী লেখক?’
বিন্দুর প্রশ্নে চমকে উঠে মৃদুল। মৃদুল কোনও বিখ্যাত লেখক নয়। ও প্রতিশ্রুতিবান লেখক হিসেবে সাহিত্যাঙ্গনে পরিচিত। তার কোন পাঠক আছে, বা তার সব লেখা পাঠ করে এমন কারো সাথে পরিচয় হয়নি ওর। বিন্দুর কথায় মনে হচ্ছে ও মৃদুলের সব লেখা মনযোগ দিয়ে পড়েছে। মৃদুলের ভীষণ ভালো লাগলো। ও বললো,
‘আপনি আমার লেখা পড়েছেন বলে মনে হচ্ছে। আমি খুব অবাক হলাম এবং ভালোও লাগছে। আপনি আমার মত অখ্যাত লেখকের লেখা কেনো পড়েছেন, জানতে ইচ্ছে করছে।’
বিন্দু একটু হাসলো। যেন মৃদুলের চমকে যাওয়াকে ও উপভোগ করছে। ও বললো,
‘আপনার লেখা পাঠ করি আমার প্রাইভেট টিউটরের কারণে। তিনি আপনার লেখার প্রশংসা করতেন। তার প্রশংসা শুনে আমি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত আপনার লেখা পাঠ করতে থাকি। ধীরে ধীরে আমি আপনার লেখার একজন নিয়মিত পাঠক ও ভক্ত হয়ে যাই।’
‘আজ আপনার সাথে পরিচিত হয়ে আমার ভীষণ ভালো লাগছে। আমার মত নতুন লেখকদের যে পাঠক আছে, তা জানতাম না। আমি এ মুহূর্তে খুবই আবেগ আপ্লুত।’
মিষ্টি করে আবার হাসলো বিন্দু। হেমন্তের শেষ বিকেলের একখন্ড রোদ এসে পড়েছে ওর মুখে। এ মিঠে-কড়া আলোয় বিন্দুকে খুবই সুন্দর লাগছে। মৃদুল মুগ্ধ হয়ে কবিতার লাইন হাতরে বেড়াতে লাগলো। বিন্দুর কণ্ঠ রিনরিনিয়ে ওঠে,
‘বললেন না যে, আপনার লেখায় এতো দুঃখ থাকে কেনো?’
এ প্রশ্নটি মৃদুলকে কাব্যময়তার দিকে ঠেলে দেয়। ওর কণ্ঠ থেকে কবিতার মতো কথা বেরিয়ে আসে,
‘দুঃখ, কষ্ট বা বিরহ সকলকে কাঁদায় ঠিক। কিন্তু লেখকের কাছে এ দুঃখ, কষ্ট বা বিরহ শিল্পের মতো ঐশ্বর্য্যময়। লেখক দুঃখকে শৈল্পিক রূপ দেন। আমিও তাই করি। হয়তো বেশি করি। এর কারণ, আমি যে সমাজটাকে দেখি, সেখানে অপ্রাপ্তির হাহাকারই বেশি। বা যাদের জীবন-যাপন দেখে অভ্যস্থ, তারা প্রতিনিয়ত দুঃখকে বরণ করছে বা মেনে নিচ্ছে। তাই আমার লেখক সত্ত্বায় এর প্রভাব বেশি।’
মৃদুলের জবাবে ওর মুখের দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে বিন্দু। এক সময় দৃষ্টি অবনত হয়। ও বলে,
‘তাই বলে কেবলই দুঃখময়তা! আনন্দের কি কোন শিল্পমান নেই?’
মৃদুল একটু সময় নিয়ে বলে,

‘জীবনের ছোট ছোট আনন্দও শিল্পের চেয়ে বেশি কিছু। আমি চেষ্টা করবো আমার লেখায় আনন্দের কথাও তুলে ধরতে। আপনি আমাকে যেন সেই পথটির কথা আজ স্মরণ করিয়ে দিলেন। আপনার কথা আমার সব সময় মনে থাকবে।’
সেদিন বিন্দু আর কথা বাড়ায়নি। মৃদুলের কথা বলতে ভালো লাগলেও নিজেকে সে পথে বাড়াতে পারেনি। এমন-ই হয়, সুন্দর সময় হয় খুব অল্প।
ওদের পরিচয়টা ওখানেই শেষ হলো না। দু’জনের আবার দেখা হলো টিএসসিতে। বিন্দু যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালের সমাজকল্যাণ বিভাগের অনার্স দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী, মৃদুল তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের মাস্টার্সের শেষ বর্ষের ছাত্র। প্রথম পরিচয়ের এক মাসের মধ্যে টিএসসিতে ওদের মধ্যে ফের দেখা হলো। মৃদুল এক পড়ন্ত দুপুরে টিএসসিতে ফুটপাতের চায়ের স্টলের সামনে বসে চা পান করছিলো। ফুটপাত ঘেঁষে এসে থামলো বিন্দুর গাড়ি। গাড়ির জানালার আয়নার কাঁচ নামিয়ে বিন্দু মৃদুলকে খুব পরিচিতজনের মত করে ডাকলো,
‘এই যে মৃদুল, এদিকে একটু তাকাবেন?’
চৈত্রের দুপুরের ভ্যাপসা গরমে অন্যমনস্ক মৃদুল প্রথমে বিন্দুর ডাক শুনতে পেল না। চায়ের স্টলের মালিক হেদু মিয়া হাসির রহস্য ছড়িয়ে মৃদুলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললো,
‘স্যার, আফনেরে পেছন থেকে একজন মেম সাহেব ডাকতেছেন!’
মৃদুল অবাক হয়ে পেছনে তাকালো। বিন্দু হাতের ইশারায় মৃদুলকে ডাকলো। মৃদুল হাদু মিয়ার চায়ের দাম মিটিয়ে এগিয়ে গেল বিন্দুর গাড়ির সামনে।
‘এখানে বসে বসে কবিতা লিখছিলেন নাকি? এতো কাছ থেকে ডাকছি, অথচ শুনতেই পারছিলেন না!’
‘সরি, আমি আসলে অন্য একটা চিন্তার মধ্যে ডুবে ছিলাম। তা আপনি এখানে কেন?’
‘বাহ্, আমি এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী, তা জানেন না বুঝি!’
‘আপনার সম্পর্কে এতো কিছু জানার সুযোগ হলো কোথায়? আর জানবোই বা কী করে?’
‘আগ্রহ থাকলেই জানা যায়। যেমন আমার আগ্রহ ছিল বলেই আপনার সম্পর্কে জেনেছি।’
‘এখন কিন্তু আপনাকে জানার আগ্রহ আমার বাড়ছে।’
‘তাই নাকি! তাহলে জানার চেষ্টা করুন।’
‘দেখি।’
‘শুধু দেখি বললেই হবে না। ভালো করে দেখতে হবে। আমার মধ্যে কিন্তু অনেক রহস্য আছে!’
‘তাই নাকি! শুনেছি, রহস্য উন্মোচন করার মধ্যেও এক ধরনের আনন্দ আছে।’
‘তাহলে নেমে পড়ুন।’
‘হুট করে নামা ঠিক হবে না। যদি রহস্যের গোলক ধাঁধায় পথ হারিয়ে ফেলি!’
‘লড়াইয়ের আগেই ভয় পেয়ে গেলেন?’
বিন্দু হাসলো। মৃদুল বললো,

‘ভয়টা রহস্য উন্মোচন করতে পারা, না পারার জন্য নয়। ভয়টা আসলে আপনার সৌন্দর্যকে নিয়ে। রহস্য উন্মোচন করতে গিয়ে যদি আপনার অপরূপ সৌন্দর্যের কাছে ইমপ্রেসড হয়ে যাই!’

এ কথায় বিন্দু খিলখিল করে হাসলো। হাসি থামার পর ও বললো,

‘আপনি তো লেখক। আমার শারীরিক সৌন্দর্যকে উপক্ষো করুন।’

‘আমি লেখক হলেও, পুরুষও। আপনার সৌন্দর্যকে উপেক্ষা করার শক্তি আমার নেই।’

কথা শুনে বিন্দু ফের খিলখিলিয়ে হেসে উঠলো। মৃদুল সঙ্কোচ বোধে মনে মনে ভাবতে লাগলো ওর কথায় অসংযত আবেগ প্রকাশ পেয়ে গেছে কিনা। কেন জানি বিন্দুর সামনে ওর সংযম বা সঙ্কোচের সীমারেখা ভেঙে যাচ্ছে।

বিন্দু হাসি থামিয়ে বললো,

‘ওভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলবেন? গাড়িতে উঠুন।’

‘না, আমি একটু পর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসে চড়ে বাড়ি যাবো।’

‘আহা! আমি তো নারায়ণগঞ্জই যাচ্ছি। উঠে বসুন। আপনাকে নামিয়ে দেব। যেতে যেতে কথাও হবে।’

মৃদুল আর কথা বাড়ালো না। ও নিসঙ্কোচে উঠে পড়লো গাড়িতে। পেছনের সিটে বিন্দুর পাশে বসতে কোনও দ্বিধা করলো না। যেন এখানেই ওর বসার কথা। সেদিন এক ধরনের সম্মোহনের মধ্য বুঁদ হয়ে পড়েছিল মৃদুল। বিন্দুর চোখে মুখে ঝলমলিয়ে ছিল রহস্যময় হাসি।

এরপর থেকে ওদের প্রায়ই দেখা হতো। মৃদুলের বাড়ি নারায়ণগঞ্জের জামতলায়। বিন্দুরা থাকে ১৫ নম্বর ধানমন্ডিতে। ওর নানীর বাড়ি নারায়ণগঞ্জের ফতুলায়। বিন্দু ওর নানীর বাড়িতে প্রায় আসতো। নানী বাড়িতে এলেই বিন্দু মৃদুলের সাথে দেখা করার চেষ্টা করতো। প্রতি মাসের দ্বিতীয় শুক্রবার চুনকা পৌর পাঠাগারে অনুষ্ঠিত হতো প্রগতি সাহিত্য পরিষদের সাহিত্য আসর। এ সাহিত্য আসরের নিয়মিত লেখক ছিল মৃদুল। বিন্দুও আসতে লাগলো এ আসরে। লেখালেখি নিয়ে এ আসরে লেখকদের জম্পেস আড্ডা হতো। বিন্দু থাকতো নীরব শ্রোতা হয়ে। সাহিত্য সভা শেষ হলে বিন্দু মৃদুলের সাথে বেরিয়ে যেত। কখনো পায়ে হেঁটে, কখনো রিকশায় চড়ে ওরা ঘুরে বেড়াতো। অজস্র কথার খই ফুটতো ওদের কথামালায়। অল্প কিছু দিনের মধ্যে ওরা একে অন্যেকে ‘তুমি’ সম্বোধন করে নিজেদের মধ্যে একটা অপ্রকাশিত সম্পর্ককে নিবিড়ভাবে গড়ে তুললো। ওরা প্রায়ই শীতলক্ষ্যা নদীতে ঘুরে বেড়াতো নৌকা দিয়ে। মৃদুলের সামনে ছিল ফাইনাল পরীক্ষা। লেখাপড়ার খুব চাপ। তবু ও চাপা আবেগে লেখাপড়ার অনেকটা সময় বিলিয়ে দিয়েছিল বিন্দুর সহচার্যে। সবটুকুই পরে অর্থহীন হয়ে যায় মৃদুলের কাছে। বিন্দু একদিন মৃদুলের আবেগ ও অস্থিত্বকে পায়ে মাড়িয়ে চলে গেল অন্যের ঘর আলো করতে।

২

তিথি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কপালে একটা নীল টিপ লাগালো। ঐ টিপটি ওর সুন্দর মুখশ্রীর মধ্যে দৃষ্টিনন্দন অবয়ব ফুটিয়ে তুললো। তিথির সাজ-সজ্জা বলতে এ পর্যন্তই। ও ঠোঁটে লিপিস্টিক বা গালে প্রসাধনের প্রলেপ খুব একটা দেয় না। বড় ধরনের কোন অনুষ্ঠানে যেতে হলে ও সামন্য সাজে। সে সময় ও চোখে কাজল লাগায়। পাউডার ও পারফিউমের সামান্য ব্যবহার হয়। সাজ-সজ্জা নিয়ে তিথি উদাসীন। খুব সাধারণ পোষাক পরিচ্ছদে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়া আসা করে। সাজ-সজ্জা না করলেও সাধারণ পোষাকে ওকে খারাপ লাগে না। ও মাঝেমাঝে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের সৌন্দর্য দেখে। তিথি জানে, ও যদি পরিপাটি করে সাজে তখন ওকে ভয়ঙ্কর সুন্দর দেখায়। এ ভয়ঙ্কর সৌন্দর্যের ভয়েই ও সাজে না। তিথির বাবা মোজাম্মেল হক ওকে বারবার বলেছেন,

'মনের সৌন্দর্য নিয়ে যদি বিকশিত হতে পারো, আর যাই হোক কেউ তোমাকে অমর্যাদা করতে পারবে না। রূপের সৌন্দর্যের আবেদন আছে ঠিক। কিন্তু এই সৌন্দর্য সকলকে মোহগ্রস্থ হতে শেখায়, মর্যাদা আদায়ে ভূমিকা রাখে না। তাই, মানুষের পাশে দাঁড়াতে হলে কিংবা তোমার পাশে মানুষকে দাঁড় করাতে হলে মনের সৌন্দর্য নিয়েই বিকশিত হও। রূপের সৌন্দর্যে কারো চোখ ধাঁধিয়ে দিয়ো না।'

তিথি ওর বাবার কথা সব সময় মনে রাখে। ওর কাছে, বাবা একজন আদর্শ মানুষ। বাবার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই ও বড় হয়েছে। নিজের শিক্ষা, জ্ঞান, রুচি সব কিছুই অর্জন করেছে ওর বাবার কাছ থেকে। তিথি ওর বাবাকে নিয়ে গর্ব বোধ করে। কারণ, ওর বাবা সারাটা জীবন সৎ জীবন যাপন করে এসেছেন।

মোজাম্মেল হক কাস্টমস বিভাগের বড় কর্মকর্তা ছিলেন। কমিশনার হিসেবে তিনি অবসর নেন। দীর্ঘ চাকরি জীবনে তিনি কখনো ঘুষ খাননি। কোনো অন্যায় কাজকে প্রশ্রয় দেননি। দুর্নীতির আশ্রয় নিলে তিনি সম্পদের পাহাড় গড়তে পারতেন। তিনি তা করেননি। এ নিয়ে তার কোনো আফসোস নেই। অহঙ্কারও নেই। মোজাম্মেল হক তার পেনশনের টাকায় নিজের গ্রামে একটি স্কুল খুলেছেন। ওই স্কুল নিয়েই প্রত্যন্ত এক গ্রামে পড়ে আছেন। তার স্বপ্ন এ স্কুলে তিনি ছাত্রদের সঠিক শিক্ষায় শিক্ষিত করবেন এবং আজীবন সৎ থাকার আদর্শে অনুপ্রাণিত করবেন। তার এ প্রচেষ্টাকে নিকট আত্মীয়-স্বজনরা 'বুড়ো বয়সের পাগলামী' বলে অভিহিত করেছেন। তবে তিথি ওর বাবার কাজকে সর্মথন করছে।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সাজতে গেলে ওর বাবার কথা মনে পড়ে যায়। তখন ওর মনে এক ধরনের পবিত্র বোধ কাজ করে। এ মুহূর্তে তিথি ওর বাবার উদ্দেশ্যে মনে মনে বললো,

'তোমাকে ভীষণ মিস করছি, বাবা!'

'আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে অমন মুগ্ধ হয়ে কী দেখছিস? নিজের রূপ?'

তিথির রুমে ঢুকেই প্রশ্নটি করলো শারমিন। শারমিনের কণ্ঠ শুনে আয়নার সামনে থেকে দ্রুত ঘুরে দাঁড়ালো তিথি। দেখলো শারমিনের মুখে দুষ্টমীর হাসি। ও বললো,

‘নিজের রূপ নিজে দেখবো কেনো?’
‘আমিও তো তাই বলি, নিজের রূপ নিজে দেখার কী আছে? তোমার রূপ দেখার কেউ কী আছে?’
‘ভাবী!’
‘আহ্া! এতে লজ্জা পাবার কী আছে? বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছো। দেখতে সুন্দরী। তোমার পেছনে তো ছেলেদের ভিড় লেগে থাকার কথা! আর প্রেম করাটাও অপরাধ নয়। তোমার কেউ থাকতেই পারে।’
‘ভাবী। আমার কেউ থাকতে পারে কিনা জানি না। তবে এমন কেউ আমার নেই।’
‘বড় হতাশার কথা। কারো নজরেই পড়ছো না?’
শারমিন বিস্ময় প্রকাশ করে। তিথি তা বুঝতে পারে। ও ব্যাখ্যা দেবার মত করে বললো,
‘ছেলেরা যে বিরক্ত করে না, তা নয়। বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা ছায়ানটে যেখানেই যাই মুগ্ধচোখের বিহবলতা দেখতে পাই। ওটা আমার ভালো লাগে না। কোনো ছেলে আমার দিকে হ্যাংলোর মতো তাকিয়ে থাকলে তাকে আমার ব্যক্তিত্বহীন পুরুষ মনে হয়। আমি তাদের উপেক্ষা করে চলি।’
শারমিন মিষ্টি করে হাসলো। তিথিকে শারমিন ভালো করেই চেনে। তারপরও রসিকতা করে বললো,
‘আমার এমন সুন্দরী ননদটার মন কেউ জয় করতে পারলো না! ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেরা কি মেয়েদের মন জয় করার কৌশল ভুলে গেছে? নাকি তারা প্রেম করার চেয়ে অসুস্থ রাজনীতিতেই জড়িয়ে পড়ছে?’
‘একদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে ছেলেদের জিজ্ঞেস করো জেনে নাও কোনটা সত্যি। একটা জরিপও করতে পারো।’
‘তাই-ই করতে হবে দেখছি! আমাদের সময় তো এমন ছিল না!’
‘তুমি তো মাত্র দু’বছর আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরুলে। দু’বছরেই আমাদের এবং তোমাদের সময়ের পার্থক্য করে ফেলছো!
‘দু’বছর কী কম সময়? দু’বছরে কত কিছু হয়ে যায়!
‘যেমন?’
‘যেমন ধরো, দু’বছরের মধ্যে আমার বিয়ে হলো। এখন মা হতে চলেছি। আর কয়েক মাস পরতো একটি শিশু আমাকে ‘মা’ বলে ডাকবে! দু’বছরের মধ্যে মেয়ে থেকে নারী, নারী থেকে মা হয়ে যাচ্ছি। তাই না?’
শারমিনের কণ্ঠ ভারী হয়ে আসে। তিথি শারমিনের কথাকে সমর্থন করে বলে,
‘তা ঠিক বলেছো। এখন বলো তো, আমাকে কী বলতে এসেছো?
ফের মিষ্টি করে হাসলো শারমিন। শারমিন এমনিতেই সুন্দরী। তারপরও সাত মাসের অন্তঃসত্ত্বা শারমিনকে আজ আরো সুন্দর লাগছে। চোখে মুখে কেমন মাতৃত্বের ভাব ফুটে আছে। তিথি শারমিনের মুখের দিকে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকে। শারমিন বললো,

‘তা, তুমি এখন কোথায় যাবার জন্য তৈরি হচ্ছিলো? ছায়ানটে যাবে?’
‘হুম্।’
‘আজ ছায়ানটে না গেলে হয় না?’
‘কেনো বলো তো?’
‘তোমাকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে যেতাম। তোমার ভাই ফোন করে জানালো, ও গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজে আটকে গেছে। তাই ও আসতে পারবে না।’
‘হয়েছে, হয়েছে। অতো কথা বলতে হবে না। ডাক্তারের কাছে যাবে, বললেই হলো। তোমাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবার চেয়ে আমার ছায়ানটের ক্লাস কি বড় হলো?’
‘আমি জানি, তুমি আমাকে পছন্দ করো।’ এ কথা বলে শারমিন হাসলো। এর জবাবে তিথি বললো,
‘শুধু পছন্দ নয়, তোমাকে ভীষণ ভালোও বাসি।’
‘তাহলে তৈরি হয়ে নাও, ড্রাইভারকে বলছি তৈরি হতে। আমরা আধা ঘন্টা পর রওনা হবো। কেমন?’
‘আচ্ছা। আমি প্রায় তৈরি। তুমি তৈরি হয়ে আমাকে ডেকো।’
শারমিন তিথির রুম থেকে চলে গেলেন। তিথি শারমিনের চলে যাওয়া পথের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলো। ও ভাবতে লাগলো শারমিন কত ভালো মেয়ে। তিথির সাথে এমন ভাবে কথা বলবে যেন নিজের ছোট বোনের সাথে কথা বলছে। অথচ শারমিন ওর আপন ভাবী নন। শারমিন ওর মামাতো ভাইয়ের স্ত্রী। তিথি মামার বাড়িতে থেকে লেখাপড়া করছে। ওর মামা আনোয়ার হোসেন একজন শিল্পপতি। সাভারে তাদের বড় স্পিনিং মিল ও বাড্ডা এলাকায় দু’টো গার্মেন্টস রয়েছে। গুলশানে বাইং হাউস। মতিঝিল সেনাকল্যাণ ভবনে তাদের ব্যবসার প্রধান কার্যালয়। ধানমন্ডির ২৭ নম্বর সড়কে তাদের বিশাল বাড়ি। মামার একমাত্র ছেলে রাশেদ আনোয়ার বাবার ব্যবসা নিয়ে ব্যস্ত। ছোট্ট সংসারে তিথি সবার আদরেই আছে। এ সংসারে প্রাচুর্যের কোন উত্তাপ বা অহমিকা নেই। শ্রদ্ধা এবং স্নেহে ভীষণ অটুট পারিবারিক বন্ধন। তিথির তা-ই মনে হয়।

৩

মৃদুলদের বাবা আজমল রায়হান ব্যবসায়ী। নারায়ণগঞ্জ শহরের টানবাজার এলাকায় তার সূতার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। উত্তারিধাকার সূত্রে তিনি এ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিক। দিনে দিনে তিনি নিজেকে আরো প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ব্যবসার প্রসার ঘটিয়েছেন। ভালো ব্যবসায়ী হিসাবে ব্যবসায়িক মহলে তার যথেষ্ট সুনাম রয়েছে। ব্যবসাই তার ধ্যান-জ্ঞান। মৃদুলের বড় ভাই মাহবুব রায়হান লেখাপাড়া পাঠ চুকিয়ে পিতার সাথে ব্যবসা দেখছে। মাহাবুব লেখাপড়া করেছে রসায়ন নিয়ে। এখন পৈত্রিক ব্যবসা সামলাচ্ছে। রসায়ন পড়ে মাহাবুবের কী লাভ হয়েছে, তা ভেবে পায় না মৃদুল। মাহাবুব ব্যবসায় ভালোই করছে। মৃদুল এ কথা ভেবে মাঝে মাঝে অবাক হয়। মৃদুলের ভাবী নীতা সুগৃহিনী। নীতার হাতেই

এখন ওদের সংসার পরিচালনার দায়িত্ব অর্পিত। ছোট বোন মলি এবার এইচএসসি পরীক্ষার্থিনী। ওর মা নাজমা রায়হান ধর্ম-কর্ম নিয়ে বেশি ব্যস্ত থাকেন। তিনি বড় ছেলের স্ত্রীর কাছে সংসারের দায়িত্ব তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত। ওদের ছোট সংসার। সংসারে কারো তেমন অভিযোগ নেই। আজমল রায়হান ও তার বড় ছেলে মাহবুব রায়হানের ব্যবসা আর সংসার ছাড়া তাদের অন্য কোনও দিকে নজর নেই। নীতা সংসারের দায়িত্ব পালন করে খুশি। মলি সকলের আদরের সংস্পর্শে সারাক্ষণ হাসি-খুশি। সবকিছু মিলিয়ে মৃদুলদের সংসারটা 'সুখী সংসার' এর মডেল হতো পারতো। কিন্তু এই সংসারেরও একটা চাপা বেদনা আছে। এক জায়গায় ছন্দপতন আছে। এ বেদনা বা ছন্দ পতনের কারণ হচ্ছে মৃদুলের বাউন্ডুলে স্বভাব। মৃদুল হঠাৎ হঠাৎ উধাও হয়ে যায়। তখন তার কোনও খোঁজ পাওয়া যায় না। বিনা নোটিশেই হঠাৎ করে সে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। গত এক বছরে সে নিরুদ্দেশ হয়েছে সাতবার।

মৃদুল মাস্টার্স পাশ করেছে দু'বছর হলো। এ পর্যন্ত ও কোনোদিন কোনো চাকরির চেষ্টা করেনি। বাবা ও ভাইয়ের সাথে ব্যবসার হালও ধরেনি। ওর বাবা ও বড় ভাই অনেকবার চেষ্টা করে বিফল হয়েছেন। মৃদুল ব্যবসার ব্যাপারে উদাসীন। ও বাড়িতে থাকলেও আজকাল ওর বাবা-ভাইয়ের সাথে ওর খুব একটা দেখা হয় না। কারণ, মৃদুল অনেক রাত করে বাড়ি ফিরে এবং প্রায় দুপুর অব্দি ঘুমায়। মাঝেমাঝে শুক্রবার ছুটির দিনে মৃদুলের দেখা পান ওর বাবা ও ভাই। তা-ও সব সময় নয়। মৃদুল খাবার টেবিলে খুব একটা আসতে চায় না। ও ওর নিজের রুমেই খেতে পছন্দ করে। কাজের বুয়া সময় মতো খাবার দিয়ে আসে ওর রুমে। আজ দুপুরে মৃদুল ডাইনিং টেবিলে এলো।

আফজাল রায়হান কথা বলেন খুব কম। তিনি চুপচাপ থাকতে পছন্দ করেন। জুরুরি বিষয় হলে তিনি কথা বলেন। খাবার টেবিলে তিনি ছোট ছেলের উদ্দেশ্যে বললেন,

'মৃদুল, এবার তুমি সাতদিন নিরুদ্দেশ থেকে কাল বাড়ি ফিরেছো, তাইনা?'

'জ্বি, বাবা।'

'এতে তোমার কী লাভ হচ্ছে বলো তো।'

'বাবা, যতই ঘুরিছি, ততই বাড়ছে অভিজ্ঞতা। কত মানুষ, কত রকম চরিত্র! ঘরে বসে থাকলে কী, এসব জানা হতো?'

'এ সব জেনেই বা তোমার কী লাভ হচ্ছে? তাছাড়া বাইরে ঘুরে বেড়ানোটা যদি তোমার শখ হয়, বাসায় ফোনে যোগাযোগটা রাখতে পারো। তোমার মোবাইল ফোনও বন্ধ থাকে।'

'তোমাকে আগেও বলেছি, এখনো বলছি, আসলে ঘুরে ঘুরে আমি গল্প খুঁজছি। আমি ভালো গল্প লিখতে চাই। আর পথে নামলে টেলিফোনে যোগাযোগ রাখাটা হয়ে উঠে না। মোবাইল ফোন সাথে নিয়ে যাই না।'

এ কথায় মৃদুলের বড় ভাই মাহাবুব বললো,

‘এ সব তোমার পাগলামী। লেখাপড়া শেষ করলে দু’বছর হলো। ব্যবসার কথা বাদই দিলাম। এ দু’বছরে তুমি একদিনও চাকুরি খুঁজোনি। খুঁজছো কিনা গল্প। জীবনে কোনটা বেশি প্রয়োজন জীবিকা না গল্প?’

ডাইনিং টেবিলে রাখা পাত্র থেকে ভাজা ইলিশ মাছের টুকরো মৃদুলের খাবারের থালায় তুলে দিতে গিয়ে নীতা তার দেবরের পক্ষ নিয়ে স্বামীর উদ্দেশ্যে বললো,

‘মাত্র তো লেখাপড়া শেষ করলো, ওকে ওর মতো ঘুরতে দাও না! দেখবে এক সময় ও-ই সবচেয়ে ভালো করছে।’

‘সেটাই তো জানতে চাচ্ছি, ভালোটা কোথায় করবে। তুমি কী শুনেছো, গল্প-উপন্যাস লিখে কেউ কখনো সাবলম্বী হয়েছে? বরং লেখকরা শেষ বয়সে অনাহারে ও বিনা চিকিৎসায় মারা যাচ্ছে।’

জবাব দিল মাহাবুব। প্রত্যুত্তরে মৃদুল বললো,

‘ভাইয়া, সে যুগ এখন আর নেই। এখন লেখকরা যথেষ্ট অর্থ আয় করছেন। হুমায়ুন আহমেদের কথাই ধরো। সেন্টমার্টিন দ্বীপে পর্যন্ত তিনি ৩ তলা বাড়ি নির্মাণ করেছেন। প্রতি বছর তিনি লাখ লাখ টাকা আয় করছেন বই লিখে বা নাটক তৈরি করে। তার কী পরিমাণ আয়, তা কল্পনা করতে পারবে না। শুধু হুমায়ুন আহমেদই নন, ইমদাদুল হক মিলন, মইনুল আহসান সাবের বা অনিসুল হকও যথেষ্ট আয় করছেন। তাছাড়া লেখকরা এখন বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে হরদম নাটক লিখছেন। তারা দু’হাতে অর্থ আয় করছেন। লেখকদের নিয়ে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা বা অবহেলার দিন শেষ হয়ে গেছে।’

‘আমরাও সেদিনটির অপেক্ষায় আছি যে, তুমি কবে বই লিখে যথেষ্ট আয় করবে, তা দেখবো বলে।’

‘আর্শীবাদ করো সেদিনটি যেন খুব তাড়িতাড়ি দেখতো পাও।’

মৃদুলের মা এবার বললেন,

‘আজকালকার ছেলেরা কেমন বেপরোয়া হয়ে যাচ্ছে। তারা মাস্তান হচ্ছে। সন্ত্রাস করছে। ওই সকল সন্ত্রাসীরা আবার সালামও পাচ্ছে। আমার মৃদুল তো সেরকম নয়। ও কাজ করছে না ঠিক, অন্যায় কিছু তো করছে না!’

নাজমা রায়হান বরাবরই ছোট ছেলের পক্ষ নেন। মায়ের কথার জবাবে মাহাবুব বললো,

‘মা, তোমার আশকারাতেই ও মাথায় উঠেছে। লেখাপড়া শিখে কিছু না করাটাও অন্যায়।’

নাজমা রায়হান বড় ছেলের কথা যেন শুনতেই পাননি এমন ভাব করে রইলেন। মৃদুল মিটিমিটি হাসতে লাগলো। নাজমা রায়হান মৃদুলের দিকে তাকিয়ে নরোম গলায় বললেন,

‘মৃদুল, তোর কাছে আমার একটা অনুরোধ আছে। সেটা রাখতে হবে।’

‘বলো কী, আমার কাছে তোমার অনুরোধ!’

‘হ্যাঁ।’

‘মা, তুমি আবার অনুরোধ করবে কেন? আদেশ করো।’

‘আহা, আদেশ করো! যেন কত আদেশ তিনি মানেন!’

মায়ের কণ্ঠে আক্ষেপ। মৃদুল বলে,
‘আদেশ করেই দেখো না!’
‘ঠিক আছে, আদেশ করছি, তোকে বিয়ে করতে হবে।’
মায়ের কথা শুনে হো হো করে হেসে উঠলো মৃদুল। নাজমা রায়হান খেপা কণ্ঠে বললেন,
‘হাসছিস কেন?’
‘মা, তুমি হাসির কথা বললে আমি হাসবো না?’
‘আমি কী হাসির কথা বলেছি?’
‘হাসির কথা নয় তো কী! এ বেকারকে কে বিয়ে করবে?’
‘সে কথা তোকে ভাবতে হবে না। আমি মেয়ে দেখে রেখেছি। এখন তুই মত দিলেই হয়।’
‘মেয়ে বা মেয়ের পরিবার জানে তো, আমি বেকার? আমি যে হঠাৎ হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়ে যাই, তা বলেছো?’
‘তা বলতে যাবো কেন?’
‘তাহলে তো মা, তুমি সত্যকে আড়াল করছো। এটা অন্যায়। ’
‘হয়েছে। তোর কাছ থেকে ন্যায়-অন্যায় শিখতে হবে না।’ নাজমা রায়হান রাগ করে খাবার টেবিল ছেড়ে ওঠে গেলেন। নীতা বললো,
‘মাকে তুমি না রাগালেও পারতে।’
মৃদুল জানে ওর মা আসলে রাগ করেননি। ছেলের উপর চাপ সৃষ্টি করার এটি তার কৌশল। ও আপন মনে খাবার খেতে লাগলো।
মাহাবুব ফের বললো,
‘তা লেখক সাহেব, তোমার পরবর্তী প্রজেক্ট কী?’
এ প্রশ্নের জবাবটা যেন তৈরিই ছিলো। মৃদুল বললো,
‘আমার পরবর্তী প্রজেক্ট হচ্ছে, বিভিন্ন পেশাজীবীর সাথে মিশে যাওয়া। তাদের জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে জেনে নিতে চাই ওদের জীবনটা কেমন। ওরাই বা ওদের জীবন নিয়ে কেমন আছে।’
‘যেমন?’
‘যেমন ধরো, এবার আমি ঠিক করেছি বেশ কয়েকদিন ট্যাক্সী চালাবো। মানে, ইয়েলো ক্যাব চালাবো। দেশে এ পেশাটা নতুন শুরু হয়েছে। এ পেশার লোকেরা কেমন আছেন, আমার জানতে ইচ্ছে করছে।’
‘এটার পর রিকসাও ধরবে নাকি!’
‘ধরতে পারি।’
এ কথায় আজমাল রায়হান ‘রাবিশ!’ বলে খাবার টেবিল ছেড়ে চলে গেলেন। মাহাবুব ও নীতা হাসতে লাগলো। মাহাবুব বললো,

‘ব্যবসায়িরাও পেশাজীবী, জানাতো? এ পেশার লোকদের সম্পর্কে জানতে হলে নিজেদের ব্যবসায় প্রথমে এসো। কাছ থেকে দেখতে পাবে আমরা কেমন আছি। আমি তোমাকে সাহায্য করবো।’

‘হয়তো আসবো। এর আগে আমাকে অনেক কিছু জেনে আসতে হবে।’

খাবার টেবিলে দু’ভাইয়ের মধ্যে আর কোনও কথা হলো না। মাহাবুব খাবার টেবিল থেকে উঠে চলে গেল। মৃদুল অনেকদিন পর তৃপ্তি সহকারে দুপুরের খাবার খেতে লাগলো। মলি খাবার টেবিলে বসে চুপচাপ দেখছিল ওর ছোটদা কতটা মনযোগ সহকারে ভাত খাচ্ছে। তাকে নিয়ে বাবা ও বড় ভাইয়ার উদ্বেগ প্রকাশের মধ্যেও ছোটদা কেমন ভাবলেশহীন। লেখকরা কী এমন হয়? মলি কৌতুহলী গলায় মৃদুলকে জিজ্ঞেস করলো,

‘ছোটদা, তোমার এ প্রজেক্টের কাজ শেষ হলে কী করবে? অনেক তো ঘুরলে!’

মৃদুল মুখ তুলে মলির দিকে চেয়ে মিষ্টি করে হাসলো। বললো,

‘পথ চলার কী শেষ আছে রে? কাজেরও শেষ নেই। প্রজেক্ট চলতেই থাকবে। এরপর আমি বিভিন্ন মাজারে মাজারে ঘুরে বেড়াবো। মাজারগুলোতে কিছু মানুষ কেন যায়। তারা কী পাচ্ছে বা কীসের আশায় তারা ছুটছে, তা জানার চেষ্টা করবো। প্রথম শুরু করবো আজমী শরীফ দিয়ে।’

এ কথার জবাবে নীতা রান্নাঘর থেকে উঁচু গলায় বললো,

‘মৃদুল, তোমার মাথাটা, সত্যিই গেছে! পীর-আউলিয়াদের মাজার নিয়ে কেউ এমন কথা বলে?’

মৃদুল সাথেসাথেই এর জাবাব দেয়।

‘ভাবী, তোমার বিয়ে হয়েছে আজ প্রায় চার বছর হলো। একটি সন্তানের আশায় তুমি কত কত পীর আউলিয়ার মাজারে গেলে। কোনো ফলাফল পেয়েছো?’

এ প্রশ্নের জবাব এলো না রান্নাঘর থেকে। মলি ফিসফিস করে বললো,

‘ছোটদা, তুমি যে কী!’

মৃদুল মলির এ কথায় বুঝতে পারলো অপ্রত্যাশিতভাবে ও নীতাকে কষ্ট দিয়ে ফেলেছে। নীতা হয়তো রান্না ঘরে চোখের জল ফেলছে। একটা অপরাধবোধ গ্রাস করলো মৃদুলকে। ও কেমন বিষণ্ন হয়ে গেল।

৪

আকাশটা রোদে গমগম করছে। ভ্যাপসা গরম। থেমে থেমে বাতাস আসছে দক্ষিণ দিক থেকে। এ বাতাসে ভ্যাপসা গরমের কিছু হচ্ছে না। গ্রীষ্মের দাবদাহ। কোথাও দাঁড়িয়ে এ গরম থেকে রক্ষা পাবার জো নেই। বাড়ি কিংবা অফিস-আদালত বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে যারা আছেন, তাদেরও স্বস্থি নেই। বিদ্যুতের লোডশেডিঙের বিড়ম্বনা লেগেই আছে। এ দাবদাহেই ছুটছে মানুষ। কারো জিরিয়ে নেবার সময়ও নেই। ঢাকা শহরটা সব সময় খুব বেশি ব্যস্ত। নাগরিক জীবনের কোলাহলমুখর এ শহর। ইস্টার্ন পাজার প্রবেশ পথে দাঁড়িয়ে

ও কথাই ভাবছিলো তিথি। এ সময় সেল ফোন থেকে ইয়েলো ক্যাব কোম্পানিতে ফোন করলো সুমি। এতে অবাক হলো তিথি। ওরা এসেছে গাড়ি নিয়ে। গাড়ি রয়েছে মার্কেটের পার্কিং পটে। অথচ সুমি কল করলো ইয়েলো ক্যাবের জন্য। তিথি সুমিকে বললো,

'এলাম তোর গাড়িতে। এখন তুই ট্যাক্সি ক্যাব ডাকছিস কেনো?

সুমি হেসে বললো,

'এতে রহস্য যেমন আছে, তেমনি সঙ্গত কারণও আছে। আমি আপাতত আমাদের ড্রাইভারকে সঙ্গে নিচ্ছি না। তাই, ট্যাক্সী কল করলাম।'

তিথি কথা বাড়ালো না। হাই স্টাটাজ বা ভীষণ ধনী পরিবারের মেয়েদের খেয়াল-খুশি বুঝা মুশকিল। ওরা মাথায় যা আসে, তাই-ই যেন করে বসে। গভীরভাবে কিছু ভাবে না, বা ভাবতে চায় না। তিথি সুমির মুখ দেখে কিছু বোঝার চেষ্টা করলো। ওর চোখে মুখে রহস্য বা সঙ্গত কারণের কোনো ছায়া দেখতে পেলো না। আশে পাশেই হয়তো ট্যাক্সি ছিল। ইস্টার্ন পাজার সামনের ব্যস্ত সড়কে একটি ইয়েলো ক্যাব এসে থামলো। ড্রাইভার যাত্রীর অপেক্ষা করছে। সুমি দ্রুত পা বাড়ালো। তিথি ওকে অনুসরণ করলো।

ট্যাক্সিতে চড়েই সুমি ড্রাইভারের উদ্দেশ্যে বললো,

'ড্রাইভার, মগবাজার যান।'

'মগবাজারের কোথায় যাবেন?'

জানতে চাইলো ড্রাইভার। এ কথায় একটু বিরক্ত হলো সুমি। মেয়ে পেসেঞ্জার দেখলেই ড্রাইভাররা কেমন বেয়ারা হয়ে যায়। বেশি কথা বলে। ট্যাক্সির ড্রাইভার বা রিকসাচালক একই আচরণ করে। সুমি বিরক্তি প্রকাশ করে বললো,

'আপনি আগে মগবাজার যান, আমি পরে বলবো কোথায় যেতে হবে।'

'ম্যাডাম, মগবাজার দু'টি। একটি বড় মগবাজার এবং অপরটি শুধু মগবাজার। পুরো ঠিকানাটা বললে আমার যেতে সুবিধা হয়। ঘুরপাক খেতে হয় না।'

সুমি বুঝতে পারলো, ড্রাইভারটি খুবই চালাক-চতুর। বেশি টাকা বিল নেবার কৌশল করছে। সুমি ধমকের সুরে বললো,

'ঘুরতে হয় ঘুরবো। আপনার অর্থ পেলেই হয়। যা বলছি, তা করুন। বড় মগবাজার যান।'

এবার ট্যাক্সি চলতে শুরু করলো। সুমির দিকে তাকিয়ে তিথি হাসতে লাগলো। সুমি আজ অকারণে রেগে যাচ্ছে। কোনো বড় ধরনের টেনশনে মানুষ এ ধরনের আচরণ করে। তিথি বুঝতে পারছে না, ও কী নিয়ে টেনশন করছে। সুমিকে ও ভালো করেই জানে। ও অনেকটা আবেগ প্রবণ ও অস্থির চিত্তের মানুষ। চট করেই ও রেগে যায়। কিন্তু রাগ ধরে রাখতে পারে না। বাইরে ওকে রাগী দেখালেও আসলে ভেতরে ও সাদামাটা, সহজ-সরল এক মানুষ। তাই, সুমিকে তিথি ভীষণ পছন্দ করে, ভালোবাসে। সুমির সাথে ওর পরিচয় ছায়ানটে। গান শিখতে গিয়েই ওদের পরিচয় এবং বন্ধুত্ব। সুমি দেশের একজন শিল্পপতির মেয়ে। ও লেখাপড়া করছে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে। ও এমবিএ-তে পড়ছে। গণিতের ছাত্রী ছুটির

দিনে শিখছে গান। এ ব্যাপারটি তিথিকে ভাবায়। মানুষের ইচ্ছা থাকলে কী না করতে পারে!

‘তুই কী ভাবছিস রে, তিথি?’ সুমির কথায় সম্বিৎ ফিরে পায় তিথি। ও বলে,

‘ভাবছি, তুই আজকে কী নিয়ে টেনশন করছিস? আমাকে জোর করে বাড়ি থেকে বের করে আনলি। বললি, জরুরি কাজ আছে।’

‘এ কথাটি মিথ্যা বলিনি। সত্যিই জরুরি একটি কাজ আমি করবো। তোকে সাথে এনেছি নিজের ভেতরের ভয়কে দূর করার জন্য।’

‘তাই নাকি! তা কী এমন কাজ!’

‘অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ। একটু পরেই জানতে পারবি।’

‘সুমি, আজকে তোর আচরণ কেমন অসংলগ্ন লাগছে।’

‘বাহ্ রে, আমার বিয়ের দিন কী আমি স্বাভাবিক আচরণ করবো?’

‘বিয়ে! তোর!’

‘হ্যাঁ।’

‘তোর কী মাথা খারাপ হয়ে গেছে?’

‘না, না। আমি সত্যি কথাই এখন তোকে বলছি। আগে বললে তুই তো আসতিস না। আমি আজ অপুকে বিয়ে করতে যাচ্ছি। আই মীন, গোপনে আমরা বিয়ে করতে যাচ্ছি।’

‘সুমি! তুই এসব কী বলছিস? অপু আর তুই না ক্লাসম্যাট!’

‘আমরা একসাথে পড়ছি বলেই তো ওকে ভালোবেসে ফেললাম। বাবা তো অপুকে তার মেয়ের জামাই হিসেবে মেনে নেবেন না। তাই, ঠিক করেছি, আমরা গোপনে বিয়ে করে ফেলবো। পরে পরিস্থিতি সামলে নেবো।’

‘এ সব কথা তুই আমাকে আগে বলিস নি কেন? বলা উচিত ছিলো।’

‘তুই রাগ করিস নে, লক্ষ্মীটি। আমার বিয়ের দিন তুই পাশে না থাকলে...!’

‘কিন্তু!’

‘কোনও কিন্তু নয়।’

‘সুমি, তোর বাবা অনেক প্রভাবশালী। এ ঘটনা জানাজানি হবার পর কোথাকার পানি কোথায় গড়াবে, কে জানে!’

‘তিথি, ওসব কথা আমিও ভেবেছি। যা হবার হবে। আগে তো আমাদের বিয়েটা হোক।’

‘সুমি, আমার হাত-পা, শরীর ঠান্ডা হয়ে আসছে! আমাকে তুই কোন্ বিপদে টেনে আনলি?’

‘ভয় পাস নে। আমি তো বিয়ে করে আজই পালিয়ে যাচ্ছি না। আমরা বিয়ে করবো। তারপর দু’জনেই দু’জনার বাড়ি ফিরে যাবো। তুই, আমি আর অপু ছাড়া এ বিয়ের কথা কেউ জানতেই পারবে না।’

তিথি চিন্তিত গলায় বললো,

‘অপু এখন কোথায়?’

‘ও মগবাজার কাজী অফিসের সামনে আমার জন্য অপেক্ষা করছে।’

‘বলিস কী! কী সাংঘাতিক ঘটনার মুখোমুখি হতে যাচ্ছি!’
‘তিথি, প্লিজ!’
ইয়োলো ট্যাক্সিটি বাংলামটর এলাকার যানজট গলে ধীর গতিতে ছুটে যাচ্ছে মগবাজারের দিকে। যানজটে গাড়ি এগুতে চায় না। নগরবাসী ঢাকা শহরের রাস্তায় নামেন যানজটের বিড়ম্বনাকে মাথায় রেখেই। এ শহরের বিভিন্ন সড়কে রিকশা চলাচল বন্ধ করে দেয়া হলেও ট্রাফিক ব্যবস্থার উন্নতি হয়নি। অনেক অসঙ্গতি আর অসম্পূর্ণতায় ক্ষত-বিক্ষত থাকছে এ শহর!

অপু কাজী অফিসের সামনে সুমির জন্য অপেক্ষা করছিলো। গাড়ি থেকে সুমি নামতেই অপু এগিয়ে এসে উদ্বিগ্ন গলায় বললো,
‘একটা সমস্যা হয়ে গেছে।’
‘কি সমস্যা?’
সুমির উদ্বেগময় প্রশ্ন।
‘বিয়ে করতে হলে দু’জন স্বাক্ষী লাগবে। আমি কাজীর সাথে বিয়ের কথা বলতেই কাজী সাহেব সাক্ষীর কথা বললেন।’
কথা শুনে সুমি যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। বললো,
‘এটা কোনো সমস্যা হলো? তুমি যে কী! সব সময় টেনশন তৈরি করো।’
‘বাহ্! এখন দু’জন স্বাক্ষী পাবো কোথায়?’
‘কেনো তিথি তো আমার সঙ্গেই আছে। ও স্বাক্ষী হবে। আর আমি গাড়ি ছেড়ে দেইনি। গাড়ির ড্রাইভারকে স্বাক্ষী করা যাবে। ব্যাস!
‘তাইতো! তুমি সত্যিই বুদ্ধিমতি!’
অপু বিগলিত হয়ে উঠলো। তিথি গাড়ি থেকে নেমে বললো,
‘তোমরা হঠাৎ করে বিয়ে করছো, কাজটি কী ঠিক হচ্ছে?’
তিথি-এর কথায় অভিমানের কণ্ঠে সুমি বললো,
‘তুই সেই কখন থেকে ওই কথাটিই বলছিস। তুই তো জানিস, আমরা একে অন্যেকে ভালোবাসি। পারিবারিকভাবে আমাদের বিয়ে হবার নয়। তাই নিজেরাই বিয়ে করছি।’
সুমিকে সমর্থন করে অপু বললো,
‘দেখুন, আমরা অনেক ভেবে-চিন্তে এভাবে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।’
তিথি অপুর দিকে তাকিয়ে বললো,
‘আপনারা কি এ সিদ্ধান্তে অনড়?’
অপু কিছু বলার আগে সুমি এর জবাবে বললো,
‘আমরা এ সিদ্ধান্তে অনড়। তুই কি স্বাক্ষী হবি?’
‘হবো না, তা তো বলিনি।’

‘তাহলে চল ড্রাইভারকে ডেকে সঙ্গে নিয়ে নিই।’ এ কথা বলেই সুমি রাস্তার পাশে পার্ক করা গাড়ির দরোজার সামনে গিয়ে ড্রাইভারের উদ্দেশ্যে বললো,
‘ড্রাইভার সাহেব, গাড়িটি লক করে নেমে আসুন তো।’
‘কেনো বলুন তো?’
অবাক চোখ তুলে বললো মৃদুল। ইয়েলো ট্যাক্সির ড্রাইভাররা যাত্রীর জন্য অপেক্ষা করে, কিন্তু যাত্রীর ডাকে কোথাও নামে না। এতে অনেক সময় ঝামেলায় পড়তে হয়। গাড়ি ছিনতাই হবার ভয়ও আছে। মহিলা যাত্রীদেরও বিশ্বাস করা যায় না। ইয়েলো ক্যাব চালকরা মৃদুলকে এ সব কথা বলেছে। মৃদুলের চিন্তিত মুখের দিকে তাকিয়ে সুমি বললো,
‘ভয় নেই। আমরা কাজী অফিসে এসেছি। আপনি আমাদের বিয়ের স্বাক্ষী হবেন। এ জন্য আপনাকে ৫ শ’ টাকা দেবো। গাড়ির ভাড়াও পাবেন।’
মৃদুল কৌতুহল প্রকাশ করে বললো,
‘আমি বিয়ের স্বাক্ষী হতে যাবো কেনো?’
‘আমাদের প্রয়োজনে। আজ আমরা বিয়ে করছি। বিয়ে করতে হলে দু’জন স্বাক্ষী লাগে। স্বাক্ষী আছে মাত্র একজন। তাই আপনি স্বাক্ষী হলে বিয়েটা হয়ে যায়।’
বিনীত গলায় কথাগুলো বললো অপু। মৃদুল ভাবতে লাগলো সে কী করবে। সুমি ফের বললো,
‘মাত্র আধা ঘন্টার কাজ। এ জন্য আপনাকে ৫ শ’ টাকা দেব। এ কাজ তো যে কেউ করতে রাজী হবে।’
‘দেখুন, আমাকে অর্থের লোভ দেখাবেন না। বিয়ের স্বাক্ষী হওয়া আমার কাজের মধ্যে পড়ে না।’
মৃদুল বিরুক্তি প্রকাশ করে। ওর কথা শুনে অপু ও সুমি দু’জনে দু’জনার দিকে হতাশ চোখে তাকায়। তিথি মৃদুলের উদ্দেশ্যে বললো,
‘দেখুন, এ কাজটি কোনো অন্যায় নয়। ওরা একে অন্যেকে ভালোবেসে বিয়ে করতে চাইছে। আমরা শুধু স্বাক্ষী হলেই ওদের আজ বিয়েটা হয়ে যায়। নইলে অন্য একদিন ওরা বিয়ে করবে। আপনি ওদের সহযোগিতা করতে পারেন। ভালো কাজে কাউকে সহযোগিতা করা অন্যায় নয়।’
‘বাবা-মাকে না জানিয়ে গোপনে বিয়ে করাটা অন্যায় নয় বলছেন!’
মৃদুলের বিস্ময়ে তিথি বললো,
‘ওরা দু’জনেই প্রাপ্ত বয়স্ক। বিয়ে করার অধিকার ওদের আছে।’
‘আইনগত অধিকার আছে, কিন্তু পারিবারিক দায়বদ্ধতাকেও এড়িয়ে যাওয়া যায় না। যায় কি?’
মৃদুলের এ কথায় তিথি একটু হচকিয়ে গেল। একজন ট্যাক্সিচালক এ ধরনের কথা বলতে পারে কি? তিথি নরম গলায় বললো,

‘ভালোবাসার সামনে এ ধরনের দায়বদ্ধতা তুচ্ছ। আসুন না, আমরা তর্ক না করে ভালোবাসার পক্ষে থাকি।’

তিথির কথা ভালো লাগলো মৃদুলের। মেয়েটি গুছিয়ে সুন্দর কথা বলতে পারে। ও চুপসে গেল। বিয়েতে স্বাক্ষী হতে ওর কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু বিনিময়ে অর্থের প্রলোভন দেখানোটা ভালো লাগেনি ওর। মৃদুল ওদের কাউকেই চিনে না। অচেনা কারো বিয়ের স্বাক্ষী হলে মন্দ কী? মৃদুল তিথির দিকে তাকিয়ে বললো,

‘ঠিক আছে, আমি রাজী হলাম শুধুমাত্র আপনার অনুরোধে।’

মৃদুলের সম্মতিতে অপু ও সুমি খুশি হয়ে ওঠে। তিথি মৃদুলকে বলে,

‘আমার অনুরোধ রাখার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।’

‘ওয়েলকাম।’

অপু বললো,

‘চলো আমরা কাজী সাহেবের কাছে যাই।’

এ কথা বলে অপু সুমির হাত ধরে কাজী অফিসের দিকে হাঁটতে লাগলো। ওদের অনুসরণ করলো তিথি ও মৃদুল।

৫

প্রায় দু’বছর পর বিন্দুকে দেখলো মৃদুল। বিন্দুর মধ্যে কিছুটা পরিবর্তন এসেছে। ছিপছিপে শরীর একটু মোটা হয়েছে। চোখে মুখে কেমন একটা ক্লান্তির ছাপ। ওর মধ্যে চঞ্চলতাও যেন নেই। বিন্দুর টেলিফোনকে উপেক্ষা করতে পারেনি মৃদুল। ওর ফোন পেয়েই সাক্ষাৎ করতে চলে এসেছে। মৃদুলের মনে নানা প্রশ্ন, কৌতুহল। আজ এতোদিন পর ওর কাছে বিন্দু কী চায়? মৃদুল বিন্দুকে সময় দিয়েছিলো বেলা চারটায়। ঠিক চারটায় রমনা রেস্তোরাঁয় মৃদুল এসে দেখে বিন্দু আগে এসেই বসে আছে। অবাক হয় মৃদুল। আগে বিন্দু কখনো প্রতিশ্রুত সময়ে আসতে পারতো না। আজ ব্যাতিক্রম। মৃদুলকে দেখেই বিন্দুর দু’চোখ আনন্দে জ্বলজ্বল করে উঠলো। ও উঠে দাঁড়ালো। বিন্দু বসেছিলো রেস্তোরাঁর লেকভিউ বারান্দায়। এ জায়গাটি মৃদুলের ভালো লাগে। মৃদুল বিন্দুর মুখোমুখি গিয়ে বসলো। বিন্দু হাতের ইশরায় বেয়ারাকে কাছে ডেকে বললো,

‘আমি যে অর্ডার দিয়েছি, তা ঠিক আধা ঘন্টা পর দেবে।’

বেয়ারা সম্মতি জানিয়ে চলে গেল। মৃদুল বুঝতে পারলো বিন্দু আজ অনেকটা সময় কাটাবে ওর সাথে। বেয়ারা চলে যেতেই ও বললো,

‘কেমন আছো, বিন্দু?’

বিন্দু তৃষ্ণার্ত চোখে মৃদুলকে দেখলো। প্রশ্নটির জবাব না দিয়ে ও বললো,

‘তুমি সেই আগের মতোই আছো!’

‘তাই নাকি! কোনো পরিবর্তন আশা করছিলে নাকি?’

‘আশা করছিলাম, তোমার মনের পরিবর্তন যেন না হয়।’

‘এতে তোমার লাভ?’
‘লাভ কী হবে জানি না। তবে এতে আমার লোকসান হবে না-এ কথা বলতে পারি।’
‘আমার প্রতি একি তোমার আস্থা? নাকি আমার দুর্বলতা ভেবে রহস্য করছো?’
মৃদুলের কণ্ঠে যেন বিদ্রুপ। বিন্দু হতাশ গলায় বললো,
‘আমি আর রহস্য করি না, মৃদুল। রহস্য করতে করতে একদিন দেখি, নিজেই এক রহস্যে পরিণত হয়ে গেছি। এ রহস্যের গোলক ধাঁধাঁ থেকে বের হতে পারছি না। তাইতো তোমার কাছে ছুটে এসেছি।’
‘কেনো? ঠিক, আমার কাছেই বা কেনো এসেছো?’
প্রশ্নটির জবাব দিতে একটু সময় নিলো বিন্দু। বললো,
‘কারণ, আমি জানি আর সবাই ফিরিয়ে দিলেও তুমি আমাকে ফিরিয়ে দেবে না।’
‘রহস্য করাটা এখনো ছাড়তে পারোনি, দেখছি।’
‘না, মৃদুল। আজ কোনও রহস্য নয়। রহস্য করার মতো সময় বা পরিস্থিতি আমার নেই। তোমার সাথে খোলাখুলি কিছু কথা বলতে চাই। আই মীন, আমি তোমার সহযোগিতা চাই। হয়তো আরো বেশি কিছু।’
‘এতোদিন পর আমার কাছে কী চাইতে এসেছো, আমার দেবারই বা কী আছে, বুঝতে পারছি না।’
বিন্দু বিষন্ন চোখে তাকালো মৃদুরের দিকে। মৃদুল খানিকটা উদ্বেগ প্রকাশ করে বললো,
‘তুমি কি কোনো সমস্যায় পড়েছো?
‘হ্যাঁ।’
‘সমস্যাটা কী, খুলে বলো।’
‘আমার পাশে দাঁড়াবে তো!’
বিন্দুর কণ্ঠে আর্তি। মৃদুল বুঝতে পারে না এর জবাবে কী বলবে। আজ এতোদিন পর বিন্দু ওর কাছে কী চায়? মৃদুলেরই বা দেবার কী আছে? প্রশ্ন দু’টো খোঁচাতে থাকে মনে। মৃদুল বলে,
‘আগে তোমার সমস্যটার কথা বলো। তারপর দেখবো কী করতে পারি।’
বিন্দু কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো। তারপর বললো,
‘মৃদুল, আমি ভালোবাসার নামে এক ধরনের উন্মাদনায় হুট করেই বিয়ে করে ফেলেছিলাম রাসেলকে। আমি জানি, আমি তোমাকে কষ্ট দিয়েছি।’
‘থাক ওসব কথা। যা বলছিলে, বলো।’
মৃদুল অপ্রিয় প্রসঙ্গ টানতে চায় না। এখন ওসব কথা বলেই বা কী হবে? নিভে যাওয়া আগুন উস্কে দিয়ে বা শুকিয়ে যাওয়া ক্ষত খুঁচিয়ে রক্তাক্ত করে মনকে বিষিয়ে তুলতে চায় না ও। বিন্দু নিজেকে স্বাভাবিক করে বললো,
‘বিয়ের পর রাসেলের সাথে চলে গেলাম নিউইয়র্কে। স্বপ্নের দেশ আমেরিকা নিয়ে সীমাহীন স্বপ্নে তাড়িত ছিলাম। কিন্তু ওই স্বপ্নের দেশটা আমার কাছে দুঃস্বপ্নের দেশ হয়ে গেল। এক

পর্যায়ে রাসেলের সাথে সম্পর্কটা কনটিনিউ করতে পারলাম না। তাই সব ছেড়ে ছুঁড়ে চলে এলাম।'

এ পর্যন্ত বলে ও থামলো। মৃদুল বললো,

'তোমার আর রাসেলের মধ্যে কি ডিভোর্স হয়ে গেছে?'

'হ্যাঁ। আমিই ওকে ডিভোর্স দিয়েছি।'

'কেন?'

'ও একটা মিথ্যাবাদী, লম্পট। বিয়ের পর ওর আসল চেহারাটা চিনতে পারি। ও আমাকে বলেছিলো, ও কম্পিউটার সাইন্সে লেখাপড়া করছে কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটিতে। কিন্তু ও নিউইয়র্ক সিটিতে ট্যাক্সি চালাতো। এর আগে ও একটি কৃষ্ণাঙ্গ মেয়েকে বিয়ে করে ইমিগ্র্যান্ট হয়েছে। ওর সাবেক স্ত্রীর গর্ভে ওর একটি সন্তানও রয়েছে। এ সব কথা ও কখনো বলেনি। ও একটা প্রতারক, ভন্ড!'

এ কথা বলে বিন্দু ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। মৃদুল কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললো,

'এতো কিছু জানার পরও দু'বছর ওর সাথে ছিলে?'

'না। সব কিছু জানতে পারি বিয়ের ছ'মাসের মধ্যে। সাত মাসের মাথায় ওকে ডিভোর্স দিই। দেশে ফিরে আসতে চাইনি। অনেকদিন চেষ্টা করলাম নতুনভাবে জীবন সাজিয়ে নিতে। কিন্তু ওখানে আর ভালো লাগছিলো না। তাই চলে এলাম। আমি বড্ড একা হয়ে গেছি, মৃদুল!'

বিন্দুর অকপটে এই অসহায়ত্ব প্রকাশে কেমন বিব্রত হয়ে গেল মৃদুল। ও সব সময় দেখেছে প্রাণবন্ত বিন্দুকে। বিধ্বস্ত বিন্দুর এ রূপ ও কখনো দেখেনি। ওর মায়া হলো।

'তুমি কি এখন অবলম্বন খুঁজছো?'

এ প্রশ্নে চমকে উঠলো যেন বিন্দু। ও মৃদুলের চোখে চোখ রেখে বললো,

'অবলম্বন! হ্যাঁ, সেরকমও বলতো পারো। মৃদুল, তুমি কি আমার পাশে দাঁড়াবে?'

প্রশ্নটি করে মৃদুলের দিকে তাকিয়ে রইলো ও। মৃদুল এ প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিল না। ও বিব্রত হয়ে পড়লো। ও কী বলবে, বুঝতে পারছে না। বিন্দু কৈফিয়ত দেবার মত করে বললো,

'এ কথা ঠিক, আমি তোমাকে উপেক্ষা করেছি। আমি মোহগ্রস্থ হয়ে রাসেলের প্রেমে ঝাঁপ দিয়েছি। এখন কি নতুন করে...?'

'বিন্দু, সব কিছু নিজের মতো হয় না।'

'চেয়ে দেখো, আমি ফুরিয়ে যাই নি। আমি...'

'বিন্দু! আলোচনার মধ্যে তোমার যৌবন আর শারীরিক সৌন্দর্যকে টেনে এনো না, প্লিজ!'

'সরি, আমার মাথা ঠিক নেই। আমি আসলে এক্সপেইন করতে পারছি না, তোমাকে আমার কতটা প্রয়োজন। আমি, আমি একটা শোধ নিতে চাই!'

'শোধ!'

‘হ্যাঁ, আমি দেখিয়ে দিতে চাই, আমি ভালো আছি। আমি হেরে যাই নি। আমাকে ভালোবাসার এখনো কেউ আছে।’
এ কথা বলে ফের ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো বিন্দু।
মৃদুল বুঝতে পারলো বিন্দু মৃদুলের কাছে এসেছে ওর নিজের প্রয়োজনে, ভালোবাসার কোনো দায় থেকে নয়। বিন্দু রাসেলকে ডিভোর্স দিলেও ও রাসেলকে দেখিয়ে দিতে চায় যে, সে ভালো থাকতে পারে। এটাও রাসেলের প্রতি ওর এক ধরনের প্রতিশোধ। রাসেলকে ও ঘৃণা করলেও ভালোবাসার বাঁধনটা যেন অলক্ষ্যে রয়ে গেছে। যা বিন্দু নিজেই জানে না। জীবন এ রকমই। মৃদুল বললো,
‘তুমি জয়-পরাজয়ের হিসাবটা কেনো করছো? সব কিছু সহজ করে মেনে নাও। কাকে দেখাতে চাও যে, তুমি ভালো আছো? আগে নিজের মুখোমুখি হও।’
বিন্দু কান্না থামিয়ে মৃদুলের একটা হাত ধরে ফেললো।
‘আমি ভীষণ ক্লান্ত! আমাকে তুমি আশ্রয় দাও, প্লিজ!’
মৃদুলের মনটা আরো বিষন্ন হয়ে গেল। এ বিন্দুর হাত ধরার জন্য ওর কত স্বপ্ন ছিলো। আজ বিন্দু নিজেই ওর হাত ধরলো, অথচ বড্ড দেরীতে। ও বললো,
‘বিন্দু, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, তোমাকে আমি কী বলবো।’
এর জবাব তৈরি ছিল বিন্দুর। ও বললো,
‘আমি বলছি না, তুমি আমাকে বিয়ে করো।’
‘তাহলে?’
‘আমাকে তোমার পাশে রাখো। আমি বড্ড নিঃসঙ্গ! এই নিঃসঙ্গতা আমার ভালো লাগে না।’
‘ঠিক আছে, তোমার যখন খারাপ লাগবে, আমাকে ফোন করো। আমি ছুটে আসব। আমরা গল্প করবো। ব্যাস।’
এ কথা শুনে ছোট্ট করে হাসলো বিন্দু। বললো,
‘তুমি এখনো বোকাই আছো। শুধু গল্প করার জন্য তোমাকে আমার প্রয়োজন নেই। আমার আরো কিছু প্রয়োজন।’
‘একটু খুলে বলো তো?’
‘যদি বলি, আজকের রাতটা আমি তোমার বুকে শুয়ে কাটিয়ে দিতে চাই, রাখবে আমার অনুরোধ?’
এ কথা শুনে হতভম্ব হয়ে গেল মৃদুল। বিন্দু কী নির্লজ্জ হয়ে গেছে? নাকি ও পাগল? মৃদুল ভাবতে লাগলো। ওর হতভম্ব মুখের দিকে চেয়ে বিন্দু নিচু কণ্ঠে বললো,
‘আমার শরীরের প্রতি কি তোমার কোনো আকর্ষণ নেই, মৃদুল?’
কথাটি গরম সীসার মতো প্রবেশ করলো ওর কানে। বিন্দু এ সব কী বলছে! বিন্দু তাকিয়ে আছে ওর মুখের দিকে। প্রশ্নটির জবাব ও আশা করছে। মৃদুল কিছুটা সময় অবনত হয়ে থাকলো। এরপর মাথা তুলে বললো,

‘তোমার সৌন্দর্য উপেক্ষা করার মতো নয়। কিন্তু তোমার শরীরকে পাওয়ার মধ্য দিয়ে আমার কিছু পাওয়া হবে না, বিন্দু। আমার কাছে তোমার স্থান আরো উপরে। ভালোবাসা না হোক, তোমাকে আমার ভালো লাগতো। এ ভালোলাগাটুকুর মর্যাদা আমি নষ্ট করতে চাই না। আমি তোমার পাশে দাঁড়াতে চাই বন্ধু হিসেবে, পুরুষ হিসাবে নয়।’
এ কথা শুনে বিন্দু নিজের মাথাটা নিচু করে ফেললো। ওর শরীরটা কেঁপে ওঠছে। হয়তো ও কাঁদছে। মৃদুল এ কান্নায় বাঁধা দিল না। এ কান্না যে অনুশোচনা ও আত্মশুদ্ধির-এ নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই ওর।
কখনো কখনো কান্না মানুষকে পবিত্র করে দেয়।

৬

বাড়িটি চিনতে কোনো অসুবিধা হলোনা মৃদুলের। বাড়ি নয় যেন বিশাল অট্টালিকা। ধানমন্ডি এলাকায় এ ধরনের অট্টালিকা খুব ধনী লোকদের হয়ে থাকে। এ আবাসিক এলাকায় দেশের ধনী ব্যক্তিরা থাকেন। এখানে সুরম্য প্রসাদ নির্মাণের অঘোষিত প্রতিযেগিতা লেগে রয়েছে। কে কার চেয়ে সুন্দর ও সুরম্য প্রসাদ নির্মাণ করতে পারেন, এ লড়াই অনেকদিন যাবত চলে আসছে। এখন শুরু হয়েছে বিভিন্ন হাউজিং কোম্পানির ফ্ল্যাট নির্মাণের হিড়িক। এখানে বাড়ছে শুধু অট্টালিকা, সে সাথে কমছে ঐতিহ্যময় পরিবেশের জৌলুস। ধানমন্ডি এলাকায় এলে মৃদুলের তা-ই মনে হয়। গতকাল রাতে যে লোকটি এ বাড়িতে এসেছেন, তার পোষাক দেখে মনে হয়নি তিনি এ অট্টালিকায় বাস করেন। ভদ্রলোক মৃদুলের ট্যাক্সিতে চড়েছিলেন। তাকে শাহবাগ থেকে গাড়িতে তুলেছিলো মৃদুল। ভাড়া হয়েছিলো ৩৮ টাকা। তিনি গুনে ৩৮ টাকাই মৃদুলকে দিয়েছেন। কোনও বকশিস দেননি। অন্যচালক হলে এতে ভীষণ মন খারাপ করতো। মৃদুলের মন খারাপ হয়নি। ভদ্রলোকের বয়স প্রায় ৫০ বছর হবে। এ বয়সের লোকেরা খরচের বেলায় খুব হিসাবী হন। কিন্তু এমন অট্টালিকায় যারা থাকেন, তাদের কৃপণতা মানায় না। ভদ্রলোককে নামিয়ে আর কোনো যাত্রী পায়নি ও। গাড়ি গ্যারেজে জমা দিতে গিয়ে ও দেখতো পেল যে, ভদ্রলোকটি তার ব্যাগ ফেলে গেছেন। এটা নতুন কিছু নয়। অনেকে ভুল করে গাড়িতে ব্যাগ ফেলে যান। ফেলা যাওয়া ব্যাগ যাত্রীরা ফেরত পান কিনা, তা জানে না মৃদুল। মৃদুল ব্যাগটি ফেরত দিতে এসেছে। এটি বাড়তি কাজ। একজন কৃপণ যাত্রীর ব্যাগ ফেরত দিতে কি সবাই আসে? এ প্রশ্নেরও জবাব জানা নেই মৃদুলের। বাড়ির গেটের সামনে দাঁড়িয়ে মৃদুল এ কথাই ভাবছিলো। বাড়ির দারোয়ান সন্দেহের চোখে মৃদুলের দিকে তাকিয়ে বললো,
‘আপনে কারে চান?’
‘কাল রাতে একজন ভদ্রলোক আমার গাড়িতে চড়ে এ বাড়িতে নেমেছিলেন। তিনি একটা ব্যাগ ফেলে গেছেন গাড়িতে। আমি সেই ব্যাগটি ফেরত দিতে এসেছি।’
মৃদুল বিশদ ব্যাখ্যা দিয়ে দেয়। দারোয়ান মৃদুলকে আপদমস্তক দেখলো। এরপর বললো,
‘আপনে ভেতরে যান। সাহেবরা ভেতরে আছেন।’

দারোয়ান গেট খুলে দিল। মৃদুল অস্বস্থি নিয়ে গেটের ভেতরে প্রবেশ করলো। বাড়ির আঙিনায় একটি বিএম ডব্লিউ ভ্যান এবং একটি লেকসাস কার দাঁড়িয়ে আছে। যে বাড়িতে এ ধরনের গাড়ি থাকে, সেই বাড়ির কেউ ইয়োলো ক্যাবে চড়ার কথা নয়। হয়তো এ বাড়ির অতিথি কেউ হবেন। চট করে বুঝে নেয় মৃদুল। অট্টালিকার প্রবেশ মুখের দরোজার সামনে দাঁড়িয়ে ও কলিং বেল টিপলো। টুং-টাং মিষ্টি একটা আওয়াজ হলো। প্রায় ২৫ সেকেন্ড পর দরোজাটি খুলে গেল। এবং দরোজা খুললো রাশেদ। মৃদুলকে দেখে ভীষণ অবাক হলো রাশেদ। মৃদুলও রাশেদের দিকে অবাক চোখে চেয়ে রইলো। ওরা দু'জন ঢাকা কলেজের ছাত্র ছিলো। দু'জন ওই কলেজে এইচএসসি পর্যন্ড় লেখাপড়া করেছে। এইচএসসি পাশ করার পর রাশেদ বিজনেস ম্যানেজম্যান্টে লেখাপড়া করতে চলে যায় অস্ট্রেলিয়ায় আর মৃদুল ভর্তি হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। দু'বন্ধুর সাথে আর যোগাযোগ হয়নি। আজ প্রায় ৮ বছর পর দু'বন্ধু মুখোমুখি হলো অপ্রত্যাশিতভাবে। দু'জনে দু'জনার দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে আছে। এক পর্যায়ে রাশেদ বললো,

'মৃ-দু-ল, তুমি!'

'এটা কি তোমাদের বাড়ি?'

মৃদুলের পাল্টা প্রশ্ন। রাশেদ ধাতস্থ হয়। বলে,

'আগে ভেতরে এসো। কতদিন পর তোমার সাথে দেখা!'

রাশেদ দরোজা থেকে সরে মৃদুলকে ভেতরে প্রবেশের পথ করে দেয়। মৃদুল দরোজা গলে ভেতরে ঢুকে পড়লো। ও রাশেদকে অনুসরণ করে ওদের বিশাল ড্রইং রুমের সোফায় গিয়ে বসলো। রাশেদ বসলো ওর মুখোমুখি।। মৃদুল বললো,

'তোমার সাথে আমার দেখা হবে, ভাবিনি।'

'তোমাকে দেখে আমিও ভীষণ অবাক হয়ে গেছি। তোমার দেখা পেয়ে আমার খুবই ভালো লাগছে। তা আমাদের বাড়ির ঠিকানা পেলে কি করে?'

রাশেদের কথায় মৃদুল ছোট্ট করে হাসলো। বললো,

'আমি ঠিক, তোমাদের বাড়িতে আসিনি। তোমার কাছেও আসিনি।'

'ঠিক বুঝলাম না, কাদের বাড়িতে এসেছো! কার কাছে এসেছো! ফান করা এখনো ছাড়োনি, দেখছি!'

বিস্ময় প্রকাশ করে রাশেদ।

'গতকাল রাতে এ বাড়িতে একজন বয়স্ক ভদ্রলোক আমার গাড়ি থেকে নেমেছেন। গাড়িতে তিনি একটি ব্যাগ ফেলে যান। আমি সেই..'

'কিন্তু ফুপাতো এসেছিলেন ইয়োলো ক্যাবে?'

'আমি ওই ইয়োলো ক্যাবের ড্রাইভার।'

'ইয়ার্কি করার আর জায়গা পাওনা, না?'

'সত্যি বলছি, বন্ধু।'

‘ঠাট্টা রাখো। আসল ঘটনাটা খুলে বলো তো! ট্যাক্সি ড্রাইভার হবার জন্য তো তুমি আর লেখাপড়া শিখোনি!’
‘আসলে আমি ক্যাব চালাচ্ছি অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য।’
‘সেটা আবার কী রকম?’
‘অন্য সময় তোমাকে এ সব কথা খুলে বলবো। আমাকে উঠতে হবে।’
‘না, না। তোমাকে ছাড়ছি না। সেই ৭-৮ বছর পর তোমার সাথে দেখা। যেভাবেই হোক দেখা যখন হয়েছে, তোমাকে ছাড়ছে কে? শারমিন, এদিকে আসো তো..’
রাশেদ উঁচু গলায় ওর স্ত্রীকে ডাকলো। মৃদুল বললো,
‘কাকে ডাকছো?’
‘আমার বউকে। তোমার সাথে পরিচয় করিয়ে দেব না?’
রাশেদের ডাকে দোতালা থেকে নেমে এলো তিথি। তিথি ড্রইংরুমের সোফায় মৃদুলকে দেখে ভীষণ অবাক হলো। রাশেদের পেছনে দাঁড়ানো তিথিকে দেখে মৃদুলও ভূত দেখার মতো চমকে ওঠলো। তিথি বিস্ময়ভরা চোখ মৃদুলের দিকে চোখ রেখে রাশেদের উদ্দেশ্যে ক্ষীণ কণ্ঠে বললো,
‘ভাইয়া, ভাবীকে ডাকছো কেনো?’
মৃদুল বুঝতে পারলো তিথি রাশেদের বোন। রাশেদ বিগলিত কণ্ঠে বললো,
‘তোমার ভাবীকে বলো, আমার কলেজ জীবনের একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু এসেছে। ওর সাথে প্রায় ৭-৮ বছর পর আজ দেখা।’
তিথি বোকার মতো হা করে তাকালো মৃদুলের দিকে। রাশেদ মৃদুলের উদ্দেশ্যে বললো,
‘মৃদুল, তোমার সাথে পরিচয় করিয়ে দিই। ও হচ্ছে তিথি। আমার কাজিন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে। ও ভালো গান গায়। আর তিথি ও হচ্ছে আমার বন্ধু, মৃদুল। আমরা একসাথে ঢাকা কলেজে পড়তাম। মৃদুলও ভালো গান গায়।’
মৃদুল আপত্তি জানিয়ে বললো,
‘রাশেদ, আমি কখনো ভালো গান গাইতাম না।’
‘হয়তো বা। ঠিক মনে পড়ছে না তোমার কী যেন একটা ভালো গুণ আছে। সে অনেকদিন আগের কথা। আমাদের বন্ধুদের মধ্যে কে জানি ভালো গান গাইতো, মৃদুল?’
‘মোহন ভালো গান গাইতো।’
‘ও হ্যাঁ। আসলে আমার স্মৃতিশক্তি ভালো না।’
এ সময় রাশেদের স্ত্রী শারমিন ড্রইংরুমে ধীরে ধীরে এলো। তিথি সোফার এক কোণে দাঁড়িয়েছিলো। ও এগিয়ে গিয়ে শারমিনের হাত ধরে এনে সোফায় বসালো। ও বসলো শারমিনের পাশে। ওর বুক দুরু দুরু কাঁপছে। রাশেদ মৃদুলকে দেখিয়ে বললো,
‘শারমিন, ও হচ্ছে আমার কলেজ জীবনের বন্ধু, মৃদুল। যার কথা তোমাকে অনেকবার বলেছি।’
শারমিন মৃদুলকে সালাম জানালো। মৃদুলও শারমিনকে শুভেচ্ছা জানালো। শারমিন বললো,

'হ্যাঁ, ওর মুখে আপনার কথা শুনেছি। আপনি ভালো গল্প লিখতেন, তাইনা?'
মৃদুল এ কথায় সম্মতি জানিয়ে মাথা নিচু করলো। রাশেদ বললো,
'ঠিক বলেছো। আমার এখন মনে পড়ছে, ও ভালো গল্প লিখতো। তুমি কি এখনো গল্প লিখো?
তিথির দৃষ্টিতে কেমন গভীর পর্যবেক্ষণ। ও মৃদুলের মুখের দিকে তাকিয়ে খুঁজতে লাগলো ট্যাক্সিচালক ও লেখকের পার্থক্য। রাশেদের প্রশ্নের জবাবে মৃদুল বললো,
'সে আর আমাদের লেখালেখি! গল্প লেখার চেষ্টা করে যাচ্ছি। ও সব কথা থাক, আমি যে কাজে এসেছি, সেটা আগে শেষ করে নিই। রাশেদ, তোমার ফুপার ব্যাগটি ফেরত দিতে চাই।'
রাশেদ বললো,
'তিথিকে ব্যাগটি দাও। এটি ওর বাবার।'
মৃদুল ব্যাগটি তিথির দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললো,
'এ ব্যাগটি কাল রাতে আপনার বাবা আমার গাড়িতে ফেলে গিয়েছিলেন। আমি এটি ফেরত দিতে এসেছি।'
তিথি যেন সম্মোহনের মধ্যে রয়েছে। বিস্ময়ের রেশে ও সোফা থেকে ওঠে মৃদুলের কাছ থেকে ব্যাগটি নিয়ে বললো,
'এ ব্যাগটিতে অনেক জরুরি কাগজ রয়েছে। ব্যাগটি হারিয়ে আমার বাবা মূষড়ে পড়েছেন। আপনাকে কী বলে যে ধন্যবাদ জানাবো, বুঝতে পারছি না।'
মৃদুল বললো,
'আপনি একদিন গান শুনিয়ে দিলেই হবে।'
এ কথায় তিথি মৃদুলের দিকে আরেকবার তাকালো। ওর শেণ্য দৃষ্টি যেন মৃদুলের ভেতরটাকে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিল। রাশেদ বললো,
'বড্ড সহজ কিছু দাবি করলে, মৃদুল।'
শারমিন আপত্তি জানালো। বললো,
'তিথির গান শোনা অতো সহজ হবে কেনো?'
মৃদুল বললো,
'ভাবী, সহজ বা কঠিন যাই হোক, গান শোনার কৌতুহল কিন্তু আমার বাড়ছে।'
তিথি এবার মুখ টিপে হাসলো।
'আপনারা কথা বলুন, আমি ব্যাগটি বাবাকে দিতে যাচ্ছি।'
এ কথা বলে তিথি চলে গেল। শারমিন মৃদুলের উদ্দেশ্যে বললো,
'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, আপনি কী করে ব্যাগটি পেলেন!'
রাশেদ বললো,

'মৃদুল, বিশেষ শখ করে ইয়েলো ক্যাব চালাচ্ছে। ফুপা কাল ওর গাড়িতেই এসেছেন। তিনি ব্যাগ ফেলে এসেছিলেন ওর গাড়িতে। ও আজ সেই ব্যাগ ফেরত দিতে এসেছে। আর দেখা হয়ে গেল আমার সাথে, ব্যাস!'
'আপনি ক্যাব চালাচ্ছেন!'
'হ্যাঁ।'
'কেন?'
'ধরে নিন শখ করে।'
শারমিন হাসলো। বললো,
'আপনি অদ্ভূত মানুষ তো!'
'আমি কিন্তু অদ্ভূত হতে চাই না। খুব সাধারণ হতে চাই। সাধারণ লোক যা করে, আমি তা-ই করছি। কিন্তু পরিচিতজনরা তা মেনে নিতে পারছেন না।'
মৃদুল আত্মপক্ষের সমর্থন করলো। শারমিন এ নিয়ে তর্ক করলো না। ও সোফা থেকে ধীরে ধীরে উঠলো। বললো,
'আপনারা দু'বন্ধু গল্প করুন। আমি কিছু খাবার পাঠিয়ে দিচ্ছি। আর হ্যাঁ, আপনি কিন্তু দুপুরে খেয়ে যাবেন।'
'দেখুন, অন্য একদিন...!'
মৃদুলের আকুতি থামিয়ে রাশেদ বললো,
'অন্য একদিন এলেই কি আমাকে পাবে, বন্ধু? আজ বাড়িতে আছি। ছুটির দিনেও আমি বাড়িতে থাকি না। এসেই যখন পড়েছো, চলো দু'বন্ধু মিলে আজ চুটিয়ে আড্ডা মারি।'
মৃদুল বললো,
'রাশেদ, আমার সত্যিই কাজ আছে।'
'রাখো তোমার কাজ। আজ তোমার দিন নয়, আজকের দিনটি আমার। আমি যা বলবো, তা-ই হবে।'
এতোদিন পরও কলেজ জীবনের এক বন্ধুকে পেয়ে রাশেদের উচ্ছ্বাস দেখে মুগ্ধ হয়ে যায় মৃদুল। মৃদুলও ওই বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার মনের জোর পায় না। তিথিকে দেখে ও কেমন আবেশিত হয়ে গেছে। ওর বুকের ভেতরে কোথাও একটা ভাঙন হচ্ছে। তিথিকে দেখে ও মুগ্ধ কেন? নিজেকে নিজেই প্রশ্ন করে ও। প্রথম পরিচয়ের দিন তিথির কথা ওর ভালো লেগেছিলো ঠিক, কিন্তু কোনও ছায়া পড়েনি মনের ক্যানভাসে। এখন মনের ক্যানভাসে রঙ ছড়িয়ে যাচ্ছে। কেন এমন হচ্ছে, কে জানে!

৭

অপুকে দেখে অবাক হলো তিথি। ছায়ানটে গানের ক্লাস শেষ হবার পর স্কুল থেকে বের হবার পথে ও অপুকে দেখতে পেল। অপু তিথির জন্য অপেক্ষা করছিলো। তিথিকে দেখে

এগিয়ে এলো অপু। ওকে কেমন বিষণ্ন দেখাচ্ছে। তিথি অপুর উদ্দেশ্যে বিস্ময় প্রকাশ করে বললো,
‘আপনি! এখানে!’
‘আপনার কাছে এসেছি।’
অপু তাড়াতাড়ি জবাব দিল।
‘আমার কাছে? কেন?’
‘আপনি কি জানেন, সুমি কোথায় গেছে?’
অপু উদ্বেগ প্রকাশ করে। এ প্রশ্নে তিথির কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ে। পাল্টা প্রশ্ন করে ও বলে,
‘সুমি কোথায় গেছে? কী হয়েছে বলুন তো!’
‘না, ঠিক আমিও বুঝতে পারছি না। গত তিন দিন যাবত সুমি ইউনিভার্সিটিতে আসছে না। ওর মোবাইলে ফোন করেও ওকে পাচ্ছি না। ওদের বাসায় ফোন করেছিলাম, স্পষ্ট কোন উত্তর পাইনি।’
‘এ সব কী বলছেন!’
‘আমি ভেবেছিলাম, আপনি হয়তো জানেন, ও কোথায় গিয়েছে।’
‘আমাকে ও কিছু জানায়নি। ও আজ গানের ক্লাসে আসেনি দেখে অবাক হইনি। কারণ, প্রায়ই ও গানের ক্লাসে আসে না। কিন্তু আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে, কোথাও একটা সমস্যা হয়েছে।’
‘আমারও তাই ধারণা।’
সম্মতি জানায় অপু। ও তিথিকে বলে,
‘আপনি কি ওদের বাসায় ফোন করে জেনে নিতে পারবেন, ও কোথায় গিয়েছে?’
‘চেষ্টা করে দেখতে পারি। সুমি আমার বান্ধবী ঠিক, কিন্তু আমি কখনো ওদের বাসায় যাইনি। এমন কী, কখনো টেলিফোনে ওর বাবা-মার সাথে আমার কথা হয়নি। শুনেছি, ওর বাবা যেমন ব্যবসা নিয়ে ব্যস্ত থাকেন, তেমনি ওর মা-ও সামাজিক কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। সুমিই আমাকে এ সব কথা বলেছে।’
‘আমিও এ সব জানি। কিন্তু সুমি হঠাৎ কেনো নিখোঁজ হয়ে যাবে, বুঝতে পারছি না।’
অপুর চোখে মুখে দুশ্চিন্তা ফুটে ওঠে। তিথি বলে,
‘আমি আজ ওদের বাসায় ফোন করবো। চেষ্টা করবো ওর বাবা বা মায়ের সাথে কথা বলতে।’
‘আমি এ অনুরোধ নিয়েই আপনার কাছে এসেছি। সেই কখোন থেকে দাঁড়িয়ে আছি ছায়ানটের সামনে।’
‘আমি আপনাকে দেখে অবাক হয়েছি। আপনি কখনো এখানে আসেননি তো, তাই।’
অপু উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে বললো,

‘আপনি তো জানেন, সুমির বাবা এ দেশের একজন বড় শিল্পপতি। তার অনেক ক্ষমতা, প্রভাব-প্রতিপত্তি। আমি চাই না, আমার সাথে সুমির হৃদয়ঘটিত সর্ম্পর্কটা ফাঁস হয়ে পড়ুক। তাই...’

‘আমি বুঝতে পেরেছি। আপনাকে কৈফিয়ত দিতে হবে না।’

‘আপনি কি সুমির খবর সংগ্রহ করে আমাকে ফোন করে জানাবেন?’

‘অবশ্যই। তবে যদি কোনও খবর সংগ্রহ করতে না পারি?’

‘আপনি ব্যর্থ হলে আমাকে বিকল্প পথ খুঁজে বের করতে হবে। আমি আর আপনার সময় নষ্ট করতে চাই না। এখন যাই, কেমন?’

‘আচ্ছা, আসুন।’

তিথির জবাব।

‘আপনার ফোনের অপেক্ষায় রইলাম।’

এ কথা বলে অনেকটা উদভ্রান্তের মতো অপু চলে গেল। পেছনে তিথি ছোট্ট করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো। এরপর অন্যমনস্ক হয়ে হাঁটতে লাগলো ও। ছায়ানট থেকে বের হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার ফাঁকা রাস্তার ফুটপাতে হাঁটতে ভালো লাগে ওর। ও মাঝেমাঝে হাঁটে। কিছুক্ষণ হেঁটে ও রিকসা নেয়। আজও তিথি ফুটপাত ধরে হাঁটতে লাগলো। চৈত্রের খরখরে দুপুর তেতে আছে। মাঝেমাঝে দমকা বাতাসের ঝাপটা এসে লাগছে। কয়েক পা এগুতেই একটি ইয়েলো ক্যাব তিথির সামনে এসে জোরে ব্রেক কষলো। একটু চমকে ওঠলো ও। আরো চমকে ওঠলো গাড়িতে মৃদুলকে দেখে। ও থমকে দাঁড়ালো।

‘অন্যমনস্ক হয়ে পায়ে হেঁটে কোথায় যাচ্ছেন?’

গাড়ির ড্রাইভিং সিটে বসে প্রশ্ন করলো মৃদুল। তিথি বিরক্ত হলো এমন ব্যক্তিগত প্রশ্নে। ও বললো,

‘আমি কোথায় যাচ্ছি, তা জেনে আপনার কী হবে?’

‘আপনাকে গন্তব্যে পৌঁছে দিতে পারি।’

‘আপনার ব্যবসা কি আজ মন্দা?’

‘ব্যবসায়িক কারণে এ প্রস্তাব দেইনি।’

‘তাহলে কি বন্ধুর বোনকে একা দেখে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে চাইছেন?’

‘ঠিক, তা-ও নয়।’

‘তাহলে?’

‘এক ধরনের মানসিক দায় থেকে নিজেকে মুক্ত করতে আপনাকে লিফট দিতে চাই।’

মৃদুল অকপটে এ কথা বললো। তিথি চোখ কপালে তুলে বললো,

‘আরেকজনের মানসিক কষ্টের কারণ হয়ে নিজের মানসিক দায় পুরণ করাটা ভদ্রতার কোন্ অভিধানে আছে?’

প্রশ্নটার জন্য প্রস্তুত ছিল না মৃদুল। ও কেমন হচকিয়ে গেল। কোথাও একটা চাবুকের সপাং আঘাত লাগলো। ও গলা নামিয়ে বললো,

‘না, মানে, আপনাকে দেখে ইচ্ছে হলো আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দিই।’
‘আপনি চাইলেই আমি আপনার ইচ্ছা পূরণ করবো কেনো?’
মৃদুল বুঝতে পারলো তিথি ওর এ প্রস্তাব পছন্দ করেনি। তিথি ওকে আঘাত করছে। মৃদুলের ভেতরে রাগ উস্কে উঠলো। মুখে তা প্রকাশ করলো না। রাগ চেপে ও বললো,
‘আপনাকে তো আমি জোর করিনি আমার ইচ্ছা পূরণ করতে। আপনার ইচ্ছে হলে গাড়িতে ওঠবেন, ইচ্ছে না হলে ওঠবেন না। আপনি গাড়িতে না ওঠলে আমি হতাশও হবো না, অপমানিত বোধও করবো না। আমি কোনো স্বপ্নের বিলাসিতায় বিভোর হয়ে এ প্রস্তাব দিই নি।’
মৃদুলের এ কথায় তিথি খানিকটা বিব্রত হলো। ও এর জবাবে কী বলবে বুঝে ওঠতে পারলো না। মৃদুল ফের বললো,
‘আপনাকে পথের মাঝে থামিয়ে বিব্রত করার জন্য আমি দুঃখিত। আসি।’
মৃদুলের কণ্ঠে রাগের উত্তাপ। ও গাড়ি স্টার্ট দিতেই তিথি ককিয়ে ওঠে,
‘শুনুন!’
‘বলুন।’
‘আমি ওঠছি আপনার গাড়িতে।’
এ কথা বলেই তিথি গাড়ির দরোজা খুলে সামনের সিটে গিয়ে বসলো। এতে অবাক হলো মৃদুল। ও বললো,
‘আপনি পেছনের সিটেও বসতে পারেন।’
‘আপনার গাড়িতে ওঠছিই যখন, তখন সামনে বা পেছনের হিসাব করে লাভ নেই। আপনি আমাকে বাসায় পৌঁছে দিন।’
মৃদুলের গাড়ি চলতে শুরু করলো। মৃদুল কোনো কথা না বলে গাড়ি চালাতে লাগলো। একটু পর তিথি নরোম গলায় বললো,
‘আপনি কি রাগ করেছেন?’
‘আমার রাগ বা অনুরাগ, কোনোটাই আপনার জন্য বিব্রতকর নয়।’
‘আপনি একটুতেই রেগে যান দেখছি! আমি কিন্তু আপনার গাড়িতে ওঠেছি।’
এ কথা বলে তিথি হাসার চেষ্টা করলো। মৃদুল এর কোনও জবাব দিল না। তিথি গুমোট পরিবেশকে হালকা করার জন্য বললো,
‘একটা প্রশ্ন করলে সঠিক জবাব দেবেন?’
‘প্রশ্নটা কি, বলুন।’
‘আপনি ছায়ানটের আশেপাশের রাস্তায় আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন, তাইনা?’
‘কী করে বুঝলেন?’
‘মেয়েদের একটি বিশেষ ইন্দ্রীয় শক্তি আছে। মেয়েরা অনেক কিছু বুঝে ফেলতে পারে। এবার বলুন তো, কী উদ্দেশ্যে আপনি আমার পিছু নিয়েছেন?’
‘বিশেষ ইন্দ্রিয় শক্তিতে কি উদ্দেশ্যের কথা জানা যায় না?’

‘উদ্দেশ্যের কথাটি আপনার কাছ থেকেই জানতে চাচ্ছি।’
‘জেনে আপনার লাভ?’
‘আমার লাভ-লোকসান যা-ই হোক, এতে আপনার কোনও লাভ হবে না-এ কথা বলতে পারি।’
তিথির কথায় ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল মৃদুল। বললো,
‘আপনার খুব অহংকার, না?’
‘আমার অহংকার কোথায় দেখলেন, আপনি?’
তিথির কণ্ঠে বিস্ময়। মৃদুল বললো,
‘সেদিন ঘটনাক্রমে আপনাদের বাড়িতে গেলাম। রাশেদ আমাকে সারাটাদিন আটকে রাখলো। দিনভর গল্প করলাম। আপনাকে দেখলাম এক ঝলক মাত্র। খাবার টেবিল থেকে বিকেলের চা পর্ব পর্যন্ত আপনি আমার সামনে আসেননি। আপনি যে কৌশল করে আমাকে এড়িয়ে গেছেন, তা আমি বুঝতে পেরেছি।’
‘এর মধ্যে আমার অহংকার কোথায় দেখলেন?’
‘এটা অহংকার নয়তো কি? ? উপেক্ষা?’
‘এর উত্তরটা আজ আমি দিতে চাচ্ছি না। শুধু এটুকু বলবো, সেদিন আপনার দৃষ্টির সামনে আমি বিব্রত হয়ে পড়ছিলাম।’
‘তাই নাকি!’
এক মুহূর্তে রাগ উবে গেল মৃদুলের। ও হো হো করে হাসতে লাগলো। তিথি লক্ষ্য করলো মৃদুল প্রাণ খুলে হাসতে পারে। এ ধরনের মানুষ জটিল হয় না। এ কথা মনে হতে তিথি নিজেও আপন মনে হেসে ওঠলো। গাড়ি চলছে ধীর গতিতে। মৃদুলের মন হঠাৎ যেন হেমন্তের আকাশে হয়ে গেছে। অভিমানের মেঘ উধাও। তিথির জড়তা কমে এসেছে। ও মৃদুলের উদ্দেশ্যে বললো,
‘শুনলাম, আপনি লেখাপড়া শিখে উদ্ভট শখে ইয়েলো ক্যাব চালাচ্ছেন?’
‘উদ্ভট শখে নয়, অভিজ্ঞতা অর্জনের বিচিত্র শখে তা করছি। গল্প লেখার জন্য আমি নানা রকম অভিজ্ঞতা অর্জন করছি।
‘অভিজ্ঞতা অর্জন না, ছাই! আসলে ওসব আপনার পাগলামি। যে লিখতে পারে, সে এমনিতেই লিখতে পারে। তাকে ঘাটে ঘাটে ঘুরতে হবে- এমন কথা কখনো শুনিনি!’
‘তাই নাকি?’
‘হ্যাঁ। অবশ্য গল্প-উপন্যাসে কিংবা সিনেমায় এ ধরনের চরিত্র দেখা যায়।’
‘আরো কিছু বলবেন?’
‘যদি রাগ না করেন, তবে বলতে পারি।’
‘বলুন, প্লিজ!’
‘আপনি যা করছেন, তাকে বলে বাউন্ডুলেপনা। আরো সহজ করে বললে, ভবঘুরের কাজ। যা করছেন, তা কিন্তু এক ধরনের হিপোক্রেসি!’

‘কার সাথে হিপোক্রেসি করছি?’
‘নিজের সাথেই করছেন। এ ছাড়া পরিবারের সাথে, সমাজের সাথে কখনো বা রাষ্ট্রের সাথেও করছেন।
‘যেমন!’
‘যেমন, আপনি নিজেকে যোগ্য করার কোনো চেষ্টা করছেন না। আপনি আপনার পরিবারের প্রতি দায়িত্ব পালন করছেন না। সমাজের প্রতি আপনার যেন কোনো কমিটমেন্ট নেই। এমন কী, নাগরিক হিসেবে আপনি রাষ্ট্রের জন্য কল্যাণকর কোনো কাজ করছেন না। অথচ আপনি রাষ্ট্র, সমাজ ও পরিবারের সকল সুযোগ সুবিধা ভোগ করেছেন। সুশিক্ষিত হতে আপনার জন্য সরকারে যে ব্যয় হয়েছে, এর কোনো প্রতিদান দিচ্ছেন না। আপনি কি কখনো ওসব ভেবে দেখেছেন?’
তিথির কথাগুলো ভাবতে লাগলো মৃদুল। এমন কথা কেউ ওকে কখনো বলেনি। ওর কথাগুলোকে অর্থহীন মনে হল না। ও বললো,
‘আপনার কথা শুনতে ভালো লাগছে। আরেকটু বলুন।’
মৃদুলের সম্মতি পেয়ে তিথি ফের বললো,
‘আপনি এক ধরনের আবেগ নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এর পক্ষে যুক্তি হিসাবে দাঁড় করিয়েছেন যে, গল্প লেখার জন্য আপনি ঘুরছেন। দায়িত্ব পালন না করে গল্প লেখার অজুহাতে যা করছেন, তা নিজের জীবনের সাথেই প্রহসন। হয়তো আপনার মনে হচ্ছে, জ্ঞান লাভ করছেন। কিন্তু এক সময় দেখবেন, আসলে আপনার হাতে কিছুই নেই। আপনার জীবন এক নিদারুন নিঃসঙ্গতায় ঝুলে আছে। সেদিন আপনাকে শুধু অনুশোচনাই করতে হবে।’
‘থামলেন কেন? আরো কিছু বলুন।’
‘আজ আপনি তারুণ্যের জোয়ারে ভেসে বেড়াচ্ছেন। হয়তো অকুণ্ঠ বাহাবা পাচ্ছেন। কিন্তু কাল হয়ে যেতে পারেন এক উচ্ছিন্ন নাগরিক। লেখক হয়তো হতে পারবেন, কিন্তু পরিপূর্ণ মানুষ বলতে যা বোঝায়, তা হতে পারবেন কিনা আমার সন্দেহ রয়েছে।’
তিথি দম নেবার ভঙ্গিতে থামলো। ও যথেষ্ট বলেছে। আর কিছু বলতে চায় না। মৃদুল এর কোনো প্রত্যুত্তর দিল না। ও মিটিমিটি হাসতে লাগলো। কিছুক্ষণ পর তিথি জানতে চাইলো,
‘আপনি আমার ওপর রাগ করেছেন, না?’
‘না, রাগ করিনি। বরং আমার ভীষণ ভালো লাগছে। আপনার প্রতি আমার আকর্ষণ আরো বেড়ে গেল।’
‘আশ্চার্য! কেনো?’
‘আমাকে নিয়ে এতো অল্প সময়ে এতোকিছু ভেবেছেন বলে। আনন্দিতও হয়েছি। আমাকে নিয়ে এর আগে এভাবে কেউ ভাবেনি কিংবা এমন কথা বলেনি। আমি আপনার সমালোচনায় মুগ্ধ। হা-হা-হা।’

মৃদুলের প্রাণ খোলা অট্টহাসির সামনে তিথিও কেমন মুগ্ধ হয়ে যায়। মৃদুলের ইয়োলো ক্যাবটি বাতাস কেটে কেটে ছুটে চলছে ধানমন্ডির দিকে। মৃদুলের মনও অকারণে ছুটছে তিথির দিকে। মনের এ ছুটে চলা ও বুঝতে পারছে। কিন্তু তিথিকে তা বুঝতে দিতে পারছে না।

৮

দেশের রাজনীতিবিদদের নিয়ে মৃদুলের যথেষ্ট আক্ষেপ আছে। বিশেষ করে দেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর কর্মকান্ড এবং নেতাদের কার্যকলাপের প্রতি ওর কোনও আস্থা নেই। নেতা বা নেত্রীরা মঞ্চে যা বলেন, বাস্তবে তা করেন বলে মনে হয়না। তাদের দেশপ্রেমের প্রকাশকে মায়কান্না বলে মনে হয় ওর। দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর কর্মকান্ড নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে হতাশা। মৃদুলও হতাশ। তবে শাহেদের প্রতি ওর দুর্বলতা আছে। শাহেদ ওর বন্ধু। ও রাজনীতি করে। সর্বক্ষণই ও ব্যস্ত রাজনীতি নিয়ে। রাজনীতি করে ও কি পায়, কে জানে। ফার্স্ট ইয়ার থেকেই শাহেদ রাজনীতিতে জড়িয়ে যায়। ও কেনো তারুণ্যের সময় নষ্ট করছে মৃদুল বুঝতে পারে না। রাজনীতি কি নেশা কিংবা কোনো অ্যাম্বিশন? মাঝে মাঝে প্রশ্নটির জবাব খোঁজে মৃদুল। শাহেদের চরিত্রের একটি বিশেষ দিক মৃদুলের ভালো লাগে। প্রেম কিংবা নারী কোনওটাই যেন ওর অভিধানে নেই। কখনো কোনো কারণে মেয়েদের দিকে ওকে কেউ তাকিয়ে থাকতে কিংবা মেয়েদের নিয়ে গল্প করতে দেখেনি। ফার্স্ট ইয়ারে পড়ার সময় মৃদুল যখন বন্ধুদের নিয়ে রাস্ড়ায় দাঁড়িয়ে স্কুলগামী মেয়েদের দেখে এক ধরনের আনন্দ পেত, শাহেদ তখন মার্কসবাদের মোটা বইয়ের পাতায় ডুবে থাকা এক মানুষ। যে বয়সে তারুণ্যে উচ্ছল যুবকরা ভালো লাগার মুগ্ধ চোখ দিয়ে জগতটাকে দেখে, সে বয়সে শাহেদ ছিলো কমরেড হবার এক অসম্ভব স্বপ্নে বিভোর। ও এখনো স্বপ্ন দেখে সমাজতন্ত্র রাষ্ট্র ব্যবস্থার। সুযোগ পেলেই ও বুর্জোয়া ও পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে ভাষণ দেয়। সোভিয়েট ইউনিয়ন ভেঙে যাবার পর ওর স্বপ্নের রঙ ফিকে হয়ে আসার কথা, কিন্তু তা হয়নি। ও মনে করে কমিউনিজমের আদর্শ বেঁচে থাকবে। একদিন না একদিন বিপ্লবের লাল পতাকা উড়বেই। ওর জন্য মৃদুলের মায়া হয়। দেশের সাধারণ লোক কমিউনিজম নিয়ে মাথা ঘামায় না। তারা গণতন্ত্র কী, তা নিয়েও খুব একটা ভাবে না। অথচ শাহেদের মতো কিছু লোক অসম্ভব এক স্বপ্নে নিজেকে কেমন বিলিয়ে দিচ্ছে। মৃদুল একদিন ঠাট্টা করে শাহেদকে জিজ্ঞেস করেছিলো,

'বিপ্লবের রঙ যদি লাল হয়, তবে রাজনীতির রঙ কি?'

এর জবাবে ও বলছিলো,

'বেদনার রঙ যদি নীল হয়, তবে অভিমানের রঙ কি?'

প্রশ্নের উত্তরে প্রশ্ন। এ নিয়ে দু'বন্ধু খুব হেসেছিলো। সমাজতন্ত্রের রাজনীতি বা আদর্শ নিয়ে দু'জনের মধ্যে আলোচনা হয়েছে মাঝে মাঝে, কিন্তু বিতর্ক হয়নি।

আজ অনেকদিন পর শাহেদ এলো। মধ্যরাতে মৃদুলের দরোজায় কড়া নাড়লো ও। ও সবসময় মধ্যরাতেই আসে। দেশের রাজনৈতিক পরিবেশ যখন উত্তাল হয়ে যায়, তখন শাহেদকে প্রায়ই গা ঢাকা দিয়ে থাকতে হয়। কখনো হুলিয়া মাথায়, কখনো অযাচিত গ্রেফতার এড়াতে ও আত্মগোপন করে। ঘনিষ্ঠ বন্ধু বা নিকট আত্মীয়-স্বজনদের বাড়িতে ও লুকিয়ে থাকে। মৃদুল শাহেদের দরোজায় করাঘাতের শব্দ চেনে। শব্দ সংকেত শুনে ও দরোজা খুলে দিল। শাহেদ মৃদুলের রুমে প্রবেশ করে বললো,

'আমি কিছু খাবো না। খেয়ে এসেছি।'

'এবার তুই অনেকদিন পর এলি! দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ভালো বলতে হবে।'

'ভালো না ছাই! দু'মহিলার ব্যক্তিগত প্রতিহিংসায় কুলষিত হয়ে পড়ছে রাজনীতি। তাদের ছেলেরাও কোমর বেঁধে নেমে পড়েছেন মাঠে। নামেই গণতন্ত্র! প্রকারান্তরে বড় রাজনৈতিক দলগুলোতে রাজতন্ত্র কায়েম হয়েছে। শালা, বুর্জোয়ারা দেশটাকে কেক বানিয়ে খাচ্ছে!'

'হয়েছে, হয়েছে। মধ্যরাতে খেপে উঠিস না। তোর ভাষণ শোনার এখানে কেউ নেই।'

মৃদুল ধমকে উঠে। শাহেদ বলে,

'তোরা যে কী! সবকিছু দেখেও মেনে নিতে অভ্যস্ত হয়ে গেছিস। যাক ও সব। তা, তোর খবর কী? লেখালেখি কেমন চলছে?'

'বেশ কিছুদিন হয় লেখালেখি করছি না।'

'গল্প লেখা বাদ দিয়ে তুই নাটক লেখা শুরু কর। দেশে এখন স্যাটালাইট টিভি চ্যানেলের দমকা বাতাস বইছে। এ হাওয়ায় গা ভাসিয়ে দে। অর্থ ও নাম দু'টোই খুব সহজে ধরা দেবে।'

'তুই, মনে হচ্ছে আজকাল টিভি দেখিস?'

'না দেখার উপায় আছে রে? তুই না চাইলেও বুর্জোয়ারা তোকে ওদের সব খাওয়াবে। মানুষের চোখে রঙিন কাঁচ লাগিয়ে ওরা ওদের স্বার্থ হাসিল করছে। সবাইকে নেশাগ্রস্থ করে রাখাটা ওদের অন্যতম কৌশল।'

'আহ্! সব কিছুতে রাজনীতি খুঁজিস কেনো, বলতো?'

'বাপধন, ভাত খাওয়া থেকে শুরু করে চাঁদে যাওয়া পর্যন্ত মানুষের জীবনের প্রতি পদক্ষেপেই রাজনীতি জড়িয়ে আছে। রাজনীতিতে তোর অরুচি থাকলেই তা থেমে যাবে না।'

'আচ্ছা বন্ধু, তোর কথাই ঠিক। এবার বল, ক'দিন থাকবি? হুলিয়া মাথায় নিয়ে এসেছিস, নাকি..?

মৃদুলের কথা শেষ না হতেই শাহেদ বললো,

'আজ আমি গা ঢাকা দেবার জন্য তোর বাসায় আসিনি।'

'তাই নাকি, আশ্চর্য!'

'হুম, তোর সাথে আমার কিছু জরুরি কথা আছে। বলতে পারিস পরামর্শ নিতে এসেছি।'

'বলিস কি! তা বলে ফেল।'

‘বলছি। তার আগে একটা সিগারেট ধরিয়ে নিই। তুই তো আবার সিগারেট খাস না। লেখক হতে চাস, অথচ সিগারেট খাস না। ব্যাপরটা কেমন পানসে পানসে লাগে। হা-হা-হা।’

শাহেদ একটা সিগারেট ধরালো। সিগারেটের ধোঁয়ার গন্ধ মৃদুল সহ্য করতে পারে না। কিন্তু শাহেদ এলে ওকে এ অত্যাচার সহ্য করতে হয়। মানুষ কেনো সিগারেট খায় ও বুঝতে পারে না। শাহেদ সিগারেটে একটা দীর্ঘ টান দিয়ে ফোঁস করে ধোঁয়া ছাড়লো। এরপর মৃদুলের দিকে তাকিয়ে গলা নামিয়ে বললো,

‘মৃদুল, আমি একটা সমস্যায় পড়েছি। এ ধরনের সমস্যা কখনো মোকাবেলা করিনি বলে তোর কাছে এসেছি।’

‘অতো ভনিতা করছিস কেনো? সমস্যাটা কি, বলে ফেল।’

মৃদুল তাগিদ দেয়। শাহেদ বলে,

‘তুই তো জানিস, আমি আগে বেশ ক’জন ছাত্র-ছাত্রী পড়িয়েছি।’

‘হুম। সে তো তিন-চার বছর আগে। কিন্তু কাকে পড়িয়েছিস, তা কখনো বলিসনি।’

‘হ্যাঁ, তা ঠিক। টিউসনি করার বিষয়টি আমি গোপন রাখতে পছন্দ করতাম।’

‘এতোদিন পর ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে কি হলো?’

‘প্রায় তিন বছর আগে আমি একটি মেয়েকে মাত্র তিন মাস পড়িয়েছিলাম। ওই ছাত্রীটির কথা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। গত কয়েকদিন আগে ছাত্রীটি আমার কাছে এসে হাজির হলো।’

এ পর্যন্ত বলে শাহেদ থামলো। মৃদুল বললো,

‘থামলি কেনো? বল।’

‘ও আমার সামনে এসে খুব কান্নাকাটি করলো। এতে আমি খুব বিব্রত হয়ে পড়লাম।’

‘কেনো তোর কাছে গিয়ে কান্নাকাটি করলো?’

‘ওর জীবনে একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে। ওই সমস্যা থেকে ও বের হবার পথ খুঁজছে।’

‘পথটা কি তোকে ধরেই ও খুঁজতে চায়?’

‘সে রকমই বলছে।’

‘কিন্তু কেনো? শিক্ষক হিসাবে এটা তোর দায়িত্বের মধ্যে পড়ে না।’

‘এটা আমিও ওকে বলেছি।’

‘ও কি বলেছে?’

‘ও বলছে, শিক্ষক হিসাবে ও আমার কাছে আসেনি। ও নাকি আমাকে পছন্দ করতো। গোপনে ভালোও বাসতো।’

কথা শুনে হো হো করে হেসে ফেললো মৃদুল। শাহেদ জানে এ কথা শুনে মৃদুল হাসবে। ওর পরিচিত যে কেউ হাসবে। মৃদুলের হাসিকে উপেক্ষা করে শাহেদ বললো,

‘মেয়েটি বলেছে, ও আমাকে ভালোবাসতো। আমি ভালোবাসতাম এ কথা বলিনি।’

‘তা তো বুঝেছি।’

‘তাহলে হাসছিস কেনো?’
‘আচ্ছা বাবা, বল। আর হাসবো না।’
‘মেয়েটি এখন আমাকে ওর পাশে চায়।’
‘মেয়েটির সমস্যা কি, সেটাই তো বললি না।’
‘ওর বিয়ে হয়েছিলো। ডিভোর্স হয়ে গেছে। এখন...।’
‘তোকে বলছে বিয়ে করতে?’
‘হ্যাঁ, আমি ফিরিয়ে দিচ্ছি। সে প্রতিদিনই আমাদের বাসায় আসছে। ভীষণ একটা উপদ্রবের মধ্যে আছি। ও আমার সামনে এসে কান্নাকাটি করছে। তুই তো জানিস, মেয়েদের আমি এড়িয়ে চলতে পারি, কিন্তু ট্যাকেল করতে পারি না।’
বিন্দুর কথা মনে পড়ে গেল মৃদুলের। বিন্দুও এসেছিলো মৃদুলের কাছে একই রকম দাবি নিয়ে। মৃদুল ফিরিয়ে দিয়েছে। শাহেদ হয়তো সরাসরি মেয়েটিকে কিছু বলতে পারছে না। ও বজ্রকণ্ঠে ভাষণ দিতে পারলেও মেয়েদের সামনে কুকড়ে যায়। মৃদুল বললো,
‘তোর কি ওই ছাত্রীর প্রতি কোনো অনুরাগ আছে?’
‘ছিঃ, কি বলছিস!’
‘তাহলে ওকে সরাসরি বলে দে, তুমি আর আমার কাছে এসো না।’
‘সেটাও তো বলেছি। কিন্তু তারপরও ও আসছে। এই যে আজ তোর বাসায় থাকলাম। সকালে ঠিকই ও আমাদের বাড়ি যাবে।’
‘এতোদিন তুই পুলিশের ভয়ে গা ঢাকা দিয়েছিস। এখন ওই মেয়ের ভয়ে গা ঢাকা দিতে হচ্ছে! হা-হা-হা।’
‘তুই হাসছিস?’
‘হাসবো নাতো, কি?’
‘নাহ্! বুঝেছি, সত্যিই আমাকে বেশ কিছুদিনের জন্য গা ঢাকা দিতে হবে।’
শাহেদ হতাশা প্রকাশ করলো। মৃদুল বললো,
‘তোর ছাত্রীর নাম কি? কে সে?’
‘ওর নাম বিন্দু।’
প্রচন্ড ধাক্কা এসে লাগলো মৃদুলের ভেতর। ঠান্ডা একটা স্রোত বয়ে গেল যেন অনুভবে। ও কিছুক্ষণ কোনো কথাই বলতে পারলো না। বিন্দু শাহেদের ছাত্রী ছিলো অথচ মৃদুল আজ এতোদিন পর এ কথাটি জানলো। মৃদুল কেমন বোকা মনে গেছে। মৃদুল ভাবতে লাগলো, বিন্দু শাহেদকে বেছে নিলো কেনো? এটা কি শাহেদের প্রতি এক ধরনের দুর্বলতা থেকে ওর কাছে যাচ্ছে? যেমন এসেছিলো মৃদুলের কাছেও। অবলম্বনের প্রয়োজনে শাহেদকে আঁকড়ে ধরতে চাইছে কী বিন্দু? নাকি মৃদুলের কাছ থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়ে শাহেদকে বেছে নিয়েছে ও শিকার হিসাবে? এটা কী বিন্দুর রহস্য করার প্রহসন নাকি প্রতিশোধের খেলা? যদি প্রতিশোধই হয়, তবে কার প্রতি এ প্রতিশোধ? কেনো? প্রশ্নগুলো পেখম ছড়িয়ে গেল মনে। শাহেদ বললো,

‘কীরে, তুই কিছু বলছিস না যে!’
‘কি বলবো? চল আমরা ঘুমিয়ে পড়ি। সকালে কথা হবে।’
মৃদুলের কণ্ঠে কেমন জড়তা।
‘ঠিক আছে।’
সম্মতি জানায় শাহেদ। ওরা ঘুমের প্রস্তুতি নিয়ে বাতি নিবিয়ে খাটে শুয়ে পড়লো। দু’জনে ঘুমানোর চেষ্টা করলো। অনেক রাত পর্যন্ত ওদের ঘুম এলো না। ওরা ঘুমানোর ভান করে শুয়ে রইলো খাটে। রাতের অন্ধকারের মতো ওদের চিন্তায় ভিন্ন ভিন্নভাবে ওঠে আসলো বিন্দুর নাম।

৯

তিথি পড়েছে টাঙ্গাইলের তাঁতের শাড়ি। মেরুন পাড়ের হালকা সবুজ রঙের শাড়িতে ওকে অপূর্ব লাগছে। কোনো প্রসাধন নেই। সাধারণ পরিপাটি সাজসজ্জার ছাপ। চোখে মুখে স্নিগ্ধ লাবণ্যের দুত্যি। মৃদুল তিথির দিকে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকে। এতটা মুগ্ধ কেনো হচ্ছে, ও জানে না। বিভিন্ন সময়ে ও অপরূপ সুন্দরী মেয়ে দেখেছে, কখনো এমন মুগ্ধ হয়নি। কিন্তু তিথির সামনে ও আজ বিহ্বল হয়ে যাচ্ছে। তিথি কী এ সব বুঝতে পারছে? প্রশ্নটা মনের ভেতর খুঁচিয়ে ওঠে। তিথিকে নিয়ে মৃদুল একটা ভাবনার ছবি আঁকতে থাকে। কিছু মেয়ে আছে, যারা কোনো প্রলোভন, মোহ বা ভালো লাগার ফাঁদে পড়ে না। নিজেদের পছন্দের বিষয় নিয়েও মাথা ঘামায় না। কারো প্রতি ভালো লাগা তৈরি হলেও তা অনুচ্চারিত বেদনা হয়েই পড়ে থাকে মনের অন্তপুরে। ‘ভালোবাসা’ তাদের কাছে আক্ষরিক শব্দ মাত্র। ওরা সোজা পথে চলে। সোজা সাপটা কথা বলে। ওদের নিয়ে কারো হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হলেও ওরা সব আবেগকে নির্মোহভাবে পদদলিত করে চলে যায়। আপাতদৃষ্টিতে ওদের নিষ্ঠুর মনে হলেও আসলে ওরা নিজের মধ্যে ঝর্ণা ধারার মতো চঞ্চল। ওদের মন সমুদ্রের মতো বিশাল। ওরা কাউকে ভালোবাসলে সর্বান্তঃকরণে ভালেবাসে। প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে যে কোনো ঘটনার মুখোমুখি থাকে পাহাড়ের মতো অনড় ও অবিচল। তিথি এ ধরনের একটি মেয়ে। তিথিকে নিয়ে মৃদুল এক মুহূর্তের ভাবনায় এ ধরনের ছবি আঁকলো। তিথি মৃদুলের ভাবুলতা দেখে অবাক দৃষ্টিতে বললো,
‘আপনি আজ এমন নির্বাক হয়ে কি দেখছেন?’
তিথির কথায় সম্বিৎ ফিরে আসে মৃদুলের। ও মনের কথা গোপন রেখে মুখে এক টুকরো হাসি ফুটিয়ে বললো,
‘হঠাৎ আমাকে জরুরি তলব কেনো করেছেন, তাই ভাবছি।’
তিথির সাথে মৃদুলের আবার দেখা হবে, এমন ভাবেনি ও। আশাও করেনি। মৃদুল নিজেকে সংযত করে নিয়েছে। ছুটন্ত ঘোড়ার লাগাম টানার মতো মনকে টেনে রাখছে ও। হঠাৎ কাল রাতে তিথিই ওকে ফোন করলো। তিথির ফোন পেয়ে প্রথমে বিস্ময়ে থ হয়ে যায় মৃদুল। ফোনের রিসিভার তুলে ‘হ্যালো’ বলতেই ও প্রান্ত থেকে তিথি বললো,

‘কাল আপনার সাথে দেখা করতে চাই। আপনাকে আমার খুবই জরুরি প্রয়োজন। দেখা করতে পারবেন?’
এ প্রশ্নের সামনে মৃদুল না করতে পারে? ওর ভেতরে কোথাও যেন একটা সুরের লহরী বেজে ওঠে। ওই সুরে ডানা ঝাপটায় মন। ও বলে,
‘কোথায় দেখা করতে চান?’
‘শাহবাগে, সিলভিয়া রেস্টুরেন্টে। দুপুর দু’টায়।’
‘আমি ঠিক দু’টায় সিলভিয়া রেস্টুরেন্টের দোতালায় থাকবো।’
‘ধন্যবাদ। আমি খুবই খুশি হলাম, আমার অনুরোধে সাড়া দেবার জন্য। তাহলে ফোন রাখি?’
‘আচ্ছা, রাখুন।’
তিথি ফোন রেখে দেবার পর মৃদুল এক রাশ প্রশ্ন এবং অর্থহীন ভালোলাগার মধ্যে ডুবে গিয়েছিলো।
আজ দুপুর পৌণে দু’টায় মৃদুল চলে এলো সিলভিয়া রেস্টুরেন্টে। তিথি এলো দু’টোয়। আবার দেখা হলো তিথির সাথে। ওরা এখন মুখোমুখি। সিলভিয়া রেস্টুরেন্টের দোতালায় স্ট্যান্ড ফ্যান ঘুরে ঘুরে বাতাস ছড়াচ্ছে। থেমে থেমে বাতাসের ঝাপটা এসে লাগছে তিথির চুলে। বাতাস কিছুক্ষণ পরপর তিথির মাথার সামনের কিছু চুল এলোমেলো করে দিচ্ছে। তিথি তা ঠিক করে নিচ্ছে। বাতাসের লুটোপুটি এবং তিথির চুল সামলানোর দৃশ্য মৃদুল উপভোগ করছে। ‘এ দৃশ্যটি যে কোনো একটি প্রিয় কবিতার প্রিয় লাইনের মতো উজ্জ্বল ও নান্দনিক’। মনে মনে বললো মৃদুল।
তিথি বললো,
‘আপনাকে আজ সত্যিই অন্যরকম লাগছে। কেমন গম্ভীর হয়ে আছেন!’
মৃদুল গম্ভীর কণ্ঠে বললো,
‘আমার উচ্ছ্বাস বা চপলতা আপনার ভালো লাগে বলে তো মনে হয় না।’
মৃদুলের কথায় তিথি হেসে ফেললো। বললো,
‘আপনি কি এখনো আমার ওপর রেগে আছেন?’
‘রাগ করবার মতো কিছু ঘটেছে কি? রাগ করলে তো আমি আসতাম না।’
মৃদুল নিজেকে স্বাভাবিক করে নেয়। তিথি ছাড়ে না। বললো,
‘এক কথাতেই মেয়েদের চোখ ফাঁকি দিতে চান? আপনার দেখছি, মেয়েদের সম্পর্কে ধারণা কম।’
‘আপনি কি আমাকে মেয়েদের সম্পর্কে ধারণা দিতে ডেকেছেন?’
এ কথায় তিথি যেন লজ্জা পেল। ও বললো,
‘সরি, আপনাকে কেনো ডেকেছি, তা-ই বলা হয়নি। আসলে আপনাকে কিছু কথা বলা দরকার। কারণ, এ ঘটনার সাথে আপনিও জড়িত রয়েছেন। তাই..’
‘ভূমিকা না করে খুলে বলুন।’

মৃদুল তাগিদ দেয়। তিথি বললো,
‘সুমি এক সপ্তাহ যাবত নিখোঁজ। হঠাৎ করে ও নিখোঁজ হয়ে গেছে।’
‘তাই নাকি! কেনো?’
‘কারণটা আমিও জানি না। এদিকে ওকে খুঁজে না পেয়ে অপু গতকাল ওদের বাড়ি গিয়েছিলো। সুমির বাবা ওকে আটক করে মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে পুলিশের কাছে তুলে দিয়েছে।’
‘বলেন কী!’
‘হ্যাঁ, একটা বিচ্ছিরি ঘটনায় টেনশনের মধ্যে আছি।’
উদ্বেগ প্রকাশ করলো তিথি। মৃদুল বললো,
‘এতে আপনার এতো টেনশন হচ্ছে কেনো? বান্ধবী নিখোঁজ বলে, নাকি নিদোর্ষ অপু মিথ্যা মামলায় ফেঁসে যাচ্ছে বলে?’
‘দু’টোই। সঙ্গে আরো একটি কারণ আছে।’
‘সেটা কি?’
‘আমরা ওদের গোপন বিয়ের সাক্ষী হয়েছি। বিয়ের ঘটনা ফাঁস হবার সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও ফাঁস হয়ে পড়বে!’
মৃদুল বিস্ময় প্রকাশ করে বললো,
‘ওদের বিয়ের সাক্ষী হয়েছি বলে আমাদের অপরাধ কি!’
‘এ ঘটনা জানাজানি হলে আমি আমার পরিবারের কাছে কি বলবো? এ ধরনের বিয়েকে আমাদের সমাজ মেনে নিতে চায় না। সেখানে ওদের বিয়েতে সাক্ষী হয়ে সহযোগিতা করেছি। তাছাড়া আপানার সাথে আমার পূর্ব পরিচয় ছিল বলেও পরিবারের সদস্যরা একটা কিছু ভেবে বসতে পারেন। কেমন একটা লজ্জার ব্যাপার বলুন তো! ’
তিথির এ কথায় মিটিমিটি হাসতে লাগলো মৃদুল। তিথি কপট রাগ প্রকাশ করে বললো,
‘আপনি হাসছেন!’
‘হাসছি আপনার নানারকম সমস্য দেখে। এখন বলুন, আসলে আপনার উদ্বেগটা কী নিয়ে?’
‘আমি ওদের গোপন বিয়ে এবং এর পরবর্তী ঘটনা নিয়ে উদ্বিগ্ন।’
‘আমি ওদের বিয়ে নিয়ে উদ্বেগের কিছু দেখছি না। কারণ, এখন হরহামেশা ছেলে-মেয়েরা একে অন্যকে পছন্দ করে বিয়ে করছে। বাবা-মা’রা অনেক সময় আপত্তি করলেও পরে মেনেও নিচ্ছেন। বলতে পারেন, সমাজ বদলে যাচ্ছে।’
‘আপনার তর্ক মেনে নিলেও বলতে হয়, সুমি ও অপুর বিয়ের অ্যাকশনটা সেরকম হবে না। সুমির বাবা-মা এ বিয়ে মেনে নেবেন না। তারা অত্যন্ড়প্রভাবশালী। ক্ষমতার জোর খাটিয়ে তারা অনেক কিছু করে ফেলতে পারেন।’
‘এর জন্য আমরা কী করতে পারি?’
‘এ জন্যই তো আপনাকে ডেকেছি। একটা উপায় বের করুন।’
‘আমার উপর ভরসা করছেন! কেনো?’

জানতে চাইলো মৃদুল। মৃদুলের প্রশ্নময় চোখে দৃষ্টি রেখে তিথি শান্ত গলায় বললো,
‘আপনার ওপর ভরসা করতে চাই। করতে পারি কি?’
এ কথার কোনো জবাব দিল না মৃদুল। ওর মনে হলো তিথির এ কথার মধ্যে একটা গভীর অর্থ রয়েছে। ও কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললো,
‘আমি দেখি, কী করতে পারি। তবে অপুকে পুলিশের কাছ থেকে ছাড়ানো কঠিন হবে। সুমির শিল্পপতি বাবা পুলিশকে টাকা দিয়ে নিশ্চয় কিনে ফেলেছেন। তবুও আমি চেষ্টা করবো।’
তিথি চুপ করে রইলো। মৃদুল হাতের ইশরায় রেস্টুরেন্টের বেয়ারাকে কাছে ডাকলো। বললো,
‘আমাদের দু’জনের জন্য ভাত-মাছ, সব্জি ও ডাল দাও।’
তিথি কিছু খাবে না বলে আপত্তি জানালো। মৃদুল ওর আপত্তি উপেক্ষা করলো। বেয়ারা চলে যেতেই ও বললো,
‘কিছু না খেয়ে এভাবে গল্প করলে রেস্টুরেন্টের মালিক তার দোকান বন্ধ করে দেবেন। তাছাড়া দুপুর বেলা নিশ্চয়ই কিছু খাননি?’
‘আমি বাড়িতে গিয়েই খাবো।’
তিথি কৈফিয়তের সুরে বললো। মৃদুল বললো,
‘একদিন রেস্টুরেন্টে খেলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না। এ নিয়ে আর কথা বাড়াবেন না। প্লিজ।’
তিথি কিছু বলতে গিয়েও বলতে পারলো না। মৃদুলের সামনে ভাত খেতে হবে বলে ও কেমন সঙ্কোচ বোধ করতে লাগলো। মৃদুল যেন ওর কথাটি বুঝতে পারলো। বললো,
‘ভাত খাওয়াটা জীবনের একটা স্বাভাবিক কাজ। এতে লজ্জা পাবার কিছু নেই। আমিও তো আপনার সামনে ভাত খাবো। পুরুষ হিসেবে আমারও তো লজ্জা থাকতে পারে, তাই না?’
‘হয়েছে, হয়েছে। আজ আপনি অনেক চটে আছেন। কী হয়েছে, বলুন তো? ক্যাব চালাতে গিয়ে কোনো এক্সিডেন্ট করেছেন নাকি?’
তিথির এ প্রশ্নে হো হো করে হেসে ফেললো মৃদুল। তিথিও ওর হাসির সাথে মৃদু হাসিতে একাত্ম হলো। রেস্টুরেন্টের অন্যান্য খদ্দেররা ওদের দিকে এক ঝলক তাকালো। হাসি থামার পর মৃদুল তিথির উদ্দেশ্যে বললো,
‘আমি এখন ট্যাক্সি চালাই না।’
‘তাই নাকি! কেনো?’
‘অন্য কিছু করার কথা ভাবছি।’
‘তা বেশ, কি করার কথা ভাবছেন?’
তিথি কৌতুহলী গলায় জানতে চাইলো। মৃদুল এর কোনও উত্তর দিল না। তিথি আবার জানতে চাইলো,
‘বললেন না, কী করার কথা ভাবছেন!’

মৃদুল মুখে দুষ্টামির হাসি ছড়িয়ে বললো,
‘এখন প্রেম করার কথা ভাবছি।’
‘তাই নাকি! স্ট্রেঞ্জ! আপনি সত্যিই একটা পাগল!’
এ কথা বলে হেসে ওঠলো তিথি। ওর হাসির দমকা হাওয়ায় যেন সাহসী হয়ে ওঠলো মৃদুল। আবেগ কাঁপা কণ্ঠে ও নিচু গলায় বললো,
‘তিথি, আপনি খুউব সুন্দর!’
হাসির ঢেউ হঠাৎ থেমে গেল। তিথি সরাসরি দৃষ্টি রাখলো মৃদুলের দৃষ্টিতে। ওর চোখে মুখে শেষ বিকেলের কোমল রোদের মতো রক্তিম আভা। কয়েকটা মুহূর্ত চেয়ে থেকেই ও দৃষ্টি নামিয়ে নিলো। মৃদুল কিছুই বললো না আর। যেন সব কথা বলা হয়ে গেছে। ও ভারমুক্ত হয়ে নিজের মধ্যে ডুবে গেল নিজস্ব নৈঃশব্দে। মুহূর্তগুলো কেমন বিমূর্ত লাগছে ওর।

১০

পুলিশ সম্পর্কে মৃদুলের ধারণা ভালো নয়। সাধারণ মানুষ পুলিশকে ভয় পায়। মৃদুল ভয় না পেলেও সমীহ করে। নির্যাতিত অনেকে সহজে থানায় যেতে চান না। পুলিশের প্রতি তাদের আস্থা নেই। অথচ পুলিশকে জনগণের বন্ধু বলা হয়। মৃদুল একদিন তেজগাঁ শিল্প এলাকায় এক পুলিশের কনস্টেবলকে মাত্র এক টাকা ঘুষ নিতে দেখেছিলো। কুড়ানো কাগজের বস্ড়া নিয়ে এক ব্যক্তি রিকসায় যাচ্ছিলেন। পুলিশ রিকসা থামিয়ে ওই বস্ড়ায় কী আছে, তা দেখতে চায়। রিকসারোহী ঝামেলা এড়াতে এক টাকা বাড়িয়ে দেন পুলিশ কনস্টেবলের দিকে। কনস্টেবল হাসি মুখে টাকাটা নিয়ে রিকসা ছেড়ে দিল। এ সময় মৃদুল যাচ্ছিলো ওই পথে। এ দৃশ্য দেখে মৃদুলের খুব কৌতুহল হলো। ও রিকসা থামিয়ে নেমে গেল পুলিশ কনস্টেবলের সামনে। কৌতুহলী গলায় বললো,
‘আপনি মাত্র এক টাকা ঘুষ খেলেন!’
মৃদুলের কথায় ওই কনস্টেবল কে?নো লজ্জা পেল না। বললো,
‘আমি খাই এক টাকা। আইজি না হয় খান এক লাখ টাকা। যার যেমন পদ, তার তেমন আয়। হি-হি-হি।’
গুলশান থানার ওসির রুমের সামনে দাঁড়িয়ে মৃদুলের আজ ওই কনস্টেবলের কথা বেশ মনে পড়লো। ওসি সাহেব কত টাকা ঘুষ খান, কে জানে! মৃদুল এসেছে গুলশান থানার ওসি রফিক আহমেদের সাথে দেখা করতে। মৃদুল জানে, পুলিশ ওকে পাত্তা দেবে না। তাই ও ওর এক সাংবাদিক বন্ধুর সাহায্য নিয়েছে। পুলিশ সাংবাদিকদের সমীহ করে। কখনো ভয়ও পায়। মৃদুলের বন্ধু আরিফ সোহেল একটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকার সাংবাদিক। ও ফোন করে এপোয়েন্টমেন্ট করে দিয়েছে থানার ওসির সাথে। আজ দুপুর ১২টায় মৃদুলকে থানায় আসতে বলেছেন থানার ওসি। ঠিক সময়ে ও এসেছে। এ মুহূর্তে ও ওসির রুমের সামনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। ওসির রুমের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে কনস্টেবল হারুন বললো,

'যান, স্যার ভেতরে আছেন।'
এ কনস্টেবল একটু আগে ওর পথ আটকে দাঁড়িয়েছিলো। রুক্ষ মেজাজে ও বিরক্ত গলায় জানতে চেয়েছিলো,
'কারে চাই?'
থানার ওসির রুমে ঢুকতে হলেও নাকি ঘুষ দিতে হয়। মৃদুল এসব কথা শুনেছে। তাই ও কনস্টেবলকে কোনও সুযোগ দিতে চায়নি। ও তাড়াতাড়ি বলে ফেলে,
'জ্বি, আমি ওসি সাহেবের সাথে দেখা করতে চাই। তিনি আমাকে আসতে বলেছেন।'
এ কথায় গলা নেমে আসে কনস্টেবল হারুনের। ও বলে,
'আপনি এখানে একটু দাঁড়ান। আমি স্যারেকে জিগাইয়া আসি। আপনার নাম কি?'
'মৃদুল। বলবেন সাংবাদিক আরিফ সোহেলের বন্ধু।'
কনস্টেবল হারুন যেন আরো চুপসে যায়। সে ওসির রুমে ঢুকে পড়ে। বেশিক্ষণ আপেক্ষা করতে হয়নি মৃদুলের। হারুন কয়েক মুহূর্ত পর এসে জানালো ওসি সাহেব তার রুমে আছেন। ওসির রুমে ঢুকে পড়লো মৃদুল। ও দেখলো ওসি রফিক আহমেদ বসে আছেন রিলভিং চেয়ারে। তার পেছনে একটি কাঠের সাইনবোর্ড। এ থানায় কে কখন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন করেছেন তাদের নাম লেখা রয়েছে ওই সাইনবোর্ডে। ওসির টেবিলে রাখা ওয়ারলেস থেকে থেমে থেমে ম্যাসেজ আসছে। রফিক আহমেদ তার মোটা শরীরটা চেয়ারে হেলিয়ে দিয়েছেন। তার পেটের ভুঁড়ি জামা ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে যেন। পুলিশ অফিসারদের শারীরিক ফিটনেসের বিষয়টি ডিপার্টমেন্ট দেখে কিনা, প্রশ্নটি উঁকি দিলো মৃদুলের মনে। রফিক আহমেদের মোটা শরীর দেখলেই বোঝা যায়, কোনো অপরাধীকে ধরতে ওই কর্মকর্তা দৌঁড়ে ২ শ' মিটারও যেতে পারবেন না। ওসি সাহেব ছোট কুত কুতে চোখে মৃদুলের দিকে তাকিয়ে ওকে হাতের ইশারায় চেয়ারে বসতে বললেন। মৃদুল টেবিলের সামনে ওসির মুখোমুখি চেয়ারে বসলো। রফিক আহমেদ আয়েশী ভঙ্গিতে চেয়ার থেকে একটু এগিয়ে এলেন। বললেন,
'আমি খুবই ব্যস্ত। একটু পরেই আমাকে ওঠে যেতে হবে। আপনি, আপনার কথা তাড়াতাড়ি বলে ফেলুন।'
'জ্বি, আমি এসেছি, অপুর ব্যাপারে কথা বলতে। কেনো ওকে থানায় আটকে রেখেছেন, তা জানতে।'
মৃদুলও সময় নষ্ট করতে চায় না। ওসি রফিক আহমেদ একটু মুচকি হাসলেন। বললেন,
'আপনি কি জানেন, অপুর বিরুদ্ধে একজন শিল্পপতির বাড়িতে ডাকাতির চেষ্টার মামলা দায়ের হয়েছে?'
'কিন্তু, এসব মিথ্যা।'
'কোনটা সত্য আর কোনটা মিথ্যা, এর মীমাংসা করবে আদালত। আমরা এর কিছুই করতে পারব না।'

‘পুলিশও অভিযোগের তদন্ত করে মামলা নেয় বলে জানি। অভিযোগ সত্য না মনে করলে পুলিশ মামলা নেয় না। সেক্ষেত্রে...’

‘মৃদুল সাহেব। আপনার চিন্তাধারার মতো এ সমাজটা চলে না। যাদের প্রভাব আছে, তারা অনেক সময় সমাজকে নিজের মতো চালাতে পারেন। তারা যা বলে, তাই হয়। আপনাকে ওসব বুঝতে হবে।’

‘তাই বলে, ন্যায়-অন্যায় বলে কিছু থাকবে না! অপুর কথাই ধরুন, একটি মেধাবী ছাত্র জড়িয়ে যাচ্ছে মিথ্যা মামলায়। আপনারা কি এ ব্যাপারে কোনও কিছু করতে পারেন না? আপনি কি আমার কাছ থেকে আসল ঘটনা শুনবেন?’

‘আমি ওসব শুনেছি। অপুর মা-বাবা মাত্র কিছুক্ষণ আগে চলে গেলেন। ওসব প্রেমের গল্প শুনে, আমি কী করবো?’

‘প্রেম করার অপরাধে অপু এ শাস্তি কেনো পাবে, বলুন?’

‘আপনি দেখছি, খুব ইমোশনাল হয়ে যাচ্ছেন। শুনুন, প্রেম করার জন্য নয়, অপু ফেঁসে যাচ্ছে প্রেমিকা হিসেবে ভুল মেয়েকে বেছে নেয়ায়। দেশে কী আর মেয়ে নেই? কেনো বাবা, শিল্পপতির মেয়ের প্রেমে ঝাঁপ দিতে গেল আপনাদের ওই অপু!’

মৃদুল এবার বিনীত গলায় বলে,

‘ওসি সাহেব, আপনি তো আসল ঘটনা বুঝতে পারছেন। আপনি কি অপুকে ছেড়ে দিতে পারেন না?’

কথা শুনে আঁতকে ওঠেন ওসি। বলেন,

‘বলেন কী! তাহলে ওই শিল্পপতি আমাকে ছাড়বে?’

অবাক হয় মৃদুল। আইনকে কীভাবে ব্যবহার করছেন কেউ কেউ। ও একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। হতাশ গলায় বলে,

‘তাহলে ওকে কোর্টে চালান করে দিন।’

‘কাল ওকে কোর্টে চালান করে দেব।’

‘আর দেখবেন, মিথ্যা মামলায় ও যেন ফেঁসে না যায়।’

‘আমি চেষ্টা করবো চার্জশিট না দিতে। তবে সব কিছু নির্ভর করছে পরিস্থিতির ওপর।’

‘ঠিক আছে। আমি আর আপনার সময় নষ্ট করতে চাই না। আমি কি অপুর সাথে একটু দেখা করতে পারি?’

ওসি বলে,

‘না। আপনাকে দেখা করতে দিতে পারবো না। মৃদুল সাহেব, ওর সাথে দেখা করে কী হবে? তারচেয়ে কোর্টে ভালো করে লড়াই করার জন্য প্রস্তুতি নিন। ভালো কোনো উকিল ধরেন। আমিও নির্দোষ অপুর মঙ্গল চাইছি বলে এ পরামর্শ দিচ্ছি। কথাটি কাউকে বলবেন না, বুঝলেন?’

‘জ্বি, আচ্ছা।’

‘আরেকটা কথা আপনাকে বলে রাখছি, মামলাটা হয়তো চলবে। মামলাটা অন্যদিকে মোড় নিতেও পারে। মামলা চলাকালে যদি কোর্টে এসে সুমি বলে যে, অপু ওকে অপহরণ করে আটকে রেখেছিলো, তবে কিন্তু অপুকে কমপক্ষে সাত বছর জেল খেটে বের হতে হবে।’

রফিক আহমেদ সাবধানী গলায় এ কথা বললেন।

‘কী যে বলছেন, ওসি সাহেব! সুমি কি ওসব বলবে? ওরা একে-অন্যেকে অনেক ভালোবাসে।’

‘রাখুন, ওসব ভালোবাসা। এ রকম কত দেখলাম! কত মেয়ে ভালোবেসে ফাঁসিয়ে দিলো প্রেমিকদের!’

‘আপনি এসব কি বলছেন!’

‘আপনাকে এ কথা বললাম, আপনি আরিফ সোহেলের বন্ধু বলে। সুমির বাবা সে চেষ্টাই করছেন। উনি খুবই ডেঞ্জারাস লোক!’

‘কিন্তু, সুমি নাকি নিখোঁজ? ওকে পাবে কোথায়?’

‘আপনি দেখছি, বোকার স্বর্গে বাস করছেন! যান, বাড়ি গিয়ে ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করুন।’

‘আপনি কী ভয় দেখাচ্ছেন?’

‘না। আপনাকে সর্তক করার জন্য কথাটি বললাম। মামলা যে কোনও সময় যে কোনও দিকে মোড় নিতে পারে!’

রফিক আহমেদ নিজের চেয়ার ছেড়ে ওঠে দাঁড়ালেন। মৃদুলও চেয়ার ছেড়ে ওঠে দাঁড়ালো। ও হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে রইলো কয়েকটা মুহূর্ত। এরপর বিষণ্ন মনে ও বের হয়ে এলো ওসির রুম থেকে। ওসিও তার রুম থেকে বের হলেন। পুলিশ অফিসার হিসাবে রফিক সাহেবকে মন্দ লোক বলে মনে হলো না মৃদুলের। ওসির কথা শুনে ওর গা যেন মৃদু কাঁপছে। ওর পানির তৃষ্ণা পেয়ে গেল। ও থানার গেটের সামনে এসে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো একটি খালি রিকসার জন্য। ওই পথ দিয়ে রিকসায় চড়ে যাচ্ছিলো শাহেদ। থানার গেটের সামনে দাঁড়ানো মৃদুলকে দেখে রিকসা থামালো ও। শাহেদকে দেখে অবাক হলো মৃদুল। শাহেদ অনেকটা চিৎকার করে বললো,

‘কী রে, তুই থানার সামনে দাঁড়িয়ে আছিস! এবার পুলিশ নিয়ে গবেষণা করবি নাকি?’

মৃদুল একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো। বললো,

‘সত্যিই পুলিশ নিয়ে গবেষণার অনেক কিছু আছে। তা, তুই এ পথ দিয়ে কোথায় যাচ্ছিস?’

শাহেদ ভীষণ উচ্ছ্বসিত গলায় বললো,

‘চল আমার সাথে। তোকে আজ ভীষণ চমকে দেবো।’

‘তুই চমকে দিবি, আমাকে! তুই কখনো কাউকে চমকে দিতে পেরেছিস?’

বিস্ময় প্রকাশ করে মৃদুল। শাহেদের চোখে মুখে রহস্যময় হাসি ফুটে ওঠে। বললো,

‘ঠিক আছে, রিকসায় ওঠ। দেখি, আজ তোকে চমকে দিতে পারি কিনা।’

মৃদুল আর কথা বাড়ালো না। ও শাহেদের সাথে রিকসায় চড়লো। রিকসা চলতে শুরু করলো। মৃদুল দুশ্চিন্তায় ডুবে গেল। শাহেদও কোনো কথা বললো না। কিছুক্ষণের মধ্যে

ওদের রিকসা দু'নম্বর গুলশানের একটি এ্যাপার্টমেন্ট হাউজের সামনে এসে থামলো। শাহেদ রিকসাওয়ালার ভাড়া মিটিয়ে দিল। মৃদুল এ্যাপার্টম্যান্টের দিকে তাকিয়ে বললো,
'তুই তো থাকিস রায়ের বাজার। এখানে কার বাসায় এলি?'
'সেটাই তো চমক, বন্ধু।'
'মানে?'
'আমার ঠিকানা এখন এই এপ্যার্টমেন্টে। বাসায় গেলে আরো চমক দেখতে পাবি।'
ওরা লিফট ধরলো। লিফট চার তলায় থামতেই শাহেদ মৃদুলকে নিয়ে নেমে গেল। মৃদুলের কৌতুহল বাড়তেই থাকে। শাহেদ ডি-৪ নম্বর এ্যাপার্টমেন্টের দরোজার সামনে এসে কলিংবেল টিপলো। ওর পেছনে মৃদুল। কলিংবেল বাজার প্রায় পনের সেকেন্ড পর দরোজা খুললো বিন্দু। বিন্দুকে দেখে ভূত দেখার মতো চমকে উঠলো মৃদুল। ভীষণ ধাক্কা এসে লাগলো ওর মনে। শাহেদ যেন মৃদুলকে চমকে দিতে পেরে খুব আনন্দিত। ও মৃদুলকে দেখিয়ে বিন্দুর উদ্দেশ্যে বললো,
'বিন্দু, আমি আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে ধরে এনেছি ওকে সারপ্রাইজ দেবো বলে।'
বিন্দু তাকিয়েছিলো মৃদুলের দিকে। মুখে মিষ্টি হাসির ঝিলিক। শাহেদ পেছনে ঘুরে মৃদুলকে বললো,
'অমন হা করে কী দেখছিস? ওর নাম বিন্দু। যার কথা তোকে বলেছিলাম। ও এখন আমার স্ত্রী। আয়, ভেতরে আয়।'
বিন্দু দরোজা থেকে সরে দাঁড়ালো। শাহেদ ভেতরে প্রবেশ করলো। মৃদুলের মুখে কোনও কথা নেই। ও যেন থ হয়ে গেছে। ও শাহেদকে অনুসরণ করে রুমের ভেতরে প্রবেশ করলো। সু-সজ্জিত ড্রইংরুম। শাহেদ রুমের দরোজা লাগিয়ে বললো,
'কী রে, চমকে গেছিস না?'
'হ্যাঁ, তুই সত্যিই চমকে দিয়েছিস। আমি ভীষণ চমকে গেছি।'
মৃদুল কথাটি বললো বিন্দুর চোখে চোখ রেখে। বিন্দুর চোখ যেন মিটিমিটি হাসছে। শাহেদ বললো,
'তুই দাঁড়িয়ে আছিস কেনো, বস।'
মৃদুল সোফায় বসে পড়লো। শাহেদ বসলো ওর মুখোমুখি। ও বিন্দুকে বললো,
'বিন্দু, ও হচ্ছে মৃদুল। যার কথা তোমাকে বলেছি। টেবিলে খাবার সাজাও। আমারা আজ একসাথে লাঞ্চ করবো।'
এ কথায় আপত্তি জানিয়ে মৃদুল বললো,
'না, না। আমার সময় নেই। একটা জরুরি কাজ আছে। আমাকে এক্ষুণিই যেতে হবে।'
বিন্দু বললো,
'বাহ্ রে, বন্ধুর স্ত্রীর সাথে প্রথম পরিচয় হলো। আর আপনি কিছু না খেয়ে এখুনিই চলে যাইতে চাইছেন!'
কথাটির মধ্যে কেমন ঝাঁঝ টের পেল মৃদুল। শাহেদ বিন্দুর কথা সমর্থন করে বললো,

‘তোকে না জানিয়ে বিয়ে করেছি বলে রাগ করেছিস? জানিস, আমি অন্তত তোকে জানাতে চেয়েছিলাম। কিন্তু বিন্দু চাচ্ছিলো, কাউকে না জানিয়ে বিয়ে করতে। অতো চিন্তা করার সময় পাইনি। হুট করেই গত সপ্তাহে বিয়ে করে ফেললাম, বুঝলি? বলতে পারিস, একেবারে নতুন সংসার। নতুন এডভেঞ্চার!’

কৈফিয়ত দেবার মতো করে কথাগুলো বললো শাহেদ। মৃদুল জানতে চাইলো,

‘এ এ্যাপার্টমেন্ট কবে কিনলি?’

এ কথায় যেন লজ্জা পেল শাহেদ। লজ্জিত গলায় বললো,

‘তুই যে কী বলিস! এমন এ্যাপার্টম্যান্ট কেনার অর্থ পাবো কোথায়? এটি বিন্দুর এ্যাপার্টমেন্ট। বলতে পারিস, ঘর জামাই হয়েছি। হা-হা-হা।’

এ সময় বিন্দু চলে গেল অন্য রুমে। শাহেদ এবার গলা নিচু করে বললো,

‘বন্ধু, মেয়েটিকে আর ফেরাতে পারলাম না। পরে ওর ভালোবাসার সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে দিলাম। কিরে, ভুল করেছি?’

এ প্রশ্নের জবাবে কী বলবে ভেবে পেল না মৃদুল। ও কেনো জানি, এ মুহূর্তে কেমন অস্বস্থি বোধ করতে লাগলো। ও শাহেদকে বললো,

‘দোস্ত, তুই সুখী হলে আমিও খুশি হবো। তুই তো কমরেড হবার অনেক চেষ্টা করলি। এবার সংসারি হ।’

‘ধন্যবাদ, বন্ধু।’

‘শাহেদ, আমাকে এখুনিই যেতে হবে। জরুরি একটা কাজ আছে। আবার তো আসবো। তখন খাবো।’

‘সত্যিই তোর জরুরি কাজ আছে?’

শাহেদ বিষণ্ন গলায় জানতে চায়।

‘বিশ্বাস কর, সত্যিই আমার একটা জরুরি কাজ আছে। কাজটির কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। হঠাৎ এখন জরুরি কাজটির কথা মনে পড়লো।’

মৃদুলের কণ্ঠে আর্তনাদ ফুটে ওঠে।

‘ঠিক আছে, দাঁড়া। বিন্দুকে ডেকে আনছি।’

বলেই শাহেদ চলে গেল কিচেনের দিকে। মৃদুল এক ঝলক তাকিয়ে দেখে নিল ওদের ড্রইংরুম। রুমটি ছিমছাম, গোছানো। দেয়ালে হালাকা সবুজ রঙের মোড়ানো। ডানপাশের দেয়ালে লিওনার্দো ভিঞ্চির আঁকা মোনালিসার ওয়েল পেন্টিঙের একটি ছবি ঝুলছে। মোনালিসার হাসি সবচেয়ে রহস্যময় বলে জনশ্রুতি আছে। মৃদুলের দৃষ্টি ওই ছবিটির দিকে আটকে গেল। ওর মনে হচ্ছে, মোনালিসার হাসির মতোই বিন্দুও রহস্যময়। এ কথা ভেবে মৃদুল আপন মনে হেসে ওঠলো। এ সময় ড্রইংরুমে ফিরে এলো শাহেদ এবং বিন্দু। বিন্দু কণ্ঠে কপট রাগ তুলে বললো,

‘আমার হাতের রান্না খেতে আপনার অরুচি কেনো? আমাকে কী আপনার বন্ধুর স্ত্রী হিসেবে পছন্দ করেননি?’

‘আহা! তুমি অমন কথা ওকে কেনো বলছো?’
ককিয়ে ওঠে শাহেদ। মৃদুল বিন্দুর দিকে তাকিয়ে বললো,
‘বন্ধুর স্ত্রী হিসেবে আপনি আমার কাছে সব সময় সম্মানিত। এখানে অপছন্দের বিষয়টি অবান্তর। আর হ্যাঁ, আমার সত্যিই জরুরি একটা কাজ আছে বলে চলে যাচ্ছি। অন্যদিন আসবো, কথা দিচ্ছি।’
‘শুধু অন্যদিন কেন রে! তুই যখন-তখন চলে আসবি।’
‘হ্যাঁ, আপনি আসলে আমারও ভালো লাগবে। শুনেছি, আপনি ভালো গল্প লিখেন। আমাকে নিয়েও একটা গল্প লিখতে পারেন। আমার জীবনে অনেক মজার গল্প আছে।’
এ কথা বলে বিন্দু আবার মিটিমিটি হাসতে লাগলো। মৃদুল ইঙ্গিতটা বুঝতে পারলো। ও বললো,
‘ঠিক আছে, আজ যাচ্ছি।’ মৃদুল সোফা থেকে ওঠে দাঁড়ালো।
শাহেদ বলালো,
‘দাঁড়া, আমি একটু আসছি।’
শাহেদ বেডরুমের দিকে চলে গেল। এবার বিন্দু এগিয়ে এলো মৃদুলের সামনে। ও খুবই নিচু গলায় বললো,
‘তোমাকে আবার দেখবো, এ অপেক্ষায় রইলাম।’
কথাটি ভীষণ বিব্রত করে দিলো মৃদুলকে। বিন্দুর এ কথার মধ্যে কী লুকিয়ে রয়েছে? কোনো অতৃপ্ত বাসনা নাকি ভালোলাগার সহজ স্বীকারোক্তি? মৃদুল শাহেদের জন্য আর অপেক্ষা করলো না। ও দরোজা খুলে বেরিয়ে এলো। বিন্দু কিছুই বললো না। পেছনে বিন্দুর রিনরিনে হাসির শব্দ শোনা গেল। মৃদুল লিফটে ওঠার আগে পেছনে ফিরে তাকালো। ও দেখলো বিন্দু দাঁড়িয়ে আছে দরোজায়। ওর মুখে মোনালিসার হাসির চেয়েও রহস্যময় হাসি। ও শাহেদের উদ্দেশ্যে মনে মনে বললো,
‘শালা! কাল মার্কসের আদর্শ এভাবেই আটকে যায় পুঁজিবাদের ফাঁদে!’

১১

শাহেদের এ্যাপার্টমেন্ট থেকে হনহন করে বেরিয়ে আসার পর থেকে মনটা বিষণ্ন হয়ে রইলো মৃদুলের। এভাবে চলে আসায় শাহেদ নিশ্চয় অবাক হবে। এ নিয়ে চিন্তা করবে। কিন্তু, না এসেও উপায় ছিল না ওর। বিন্দুর ব্যাকুল আর্তির সামনে ও দাঁড়িয়ে থাকতে পারেনি। শাহেদকে না হয় পরে একটা কিছু বলে দিলেই হবে। এ কথা ভেবে মৃদুল নিজেকে নিজে সান্তনা দেয়। ও দাঁড়িয়ে আছে দু’নম্বর গুলশানের গোল চত্বর এলাকার ফুটপাতে। মাথার ওপর খটখটে রোদের ঝাঁঝালো দুপুর। ও দরদর করে ঘামছে। ওর ভেতরটাও ঘামছে। তিথিকে ফোন করতে হবে। ওকে ওসি রফিক আহমেদের কথাগুলো জানানো দরকার। ও মানি ব্যাগে রাখা টেলিফোন ইনডেক্স বের করে তিথিদের বাড়ির টেলিফোন নম্বর খুঁজতে

লাগলো। এমন সময় ওর সেল ফোন বেজে ওঠলো। সেল ফোনের স্ক্রিণে ভেসে ওঠা নম্বর দেখে ও বুঝতে পারলো কলটি তিথিদের বাড়ি থেকে এসেছে। ও সেল ফোন রিসিভ করল।
‘হ্যালো...।’
‘আমি তিথি বলছি।’
‘তিথি, আমি তোমার কথাই ভাবছিলাম। হয়তো এখুনি ফোনও করতাম। এরমধ্যেই তোমার ফোন এলো...।’
‘কী খবর বলুন তো! থানায় গিয়েছিলেন?’
‘হ্যাঁ। এইতো কিছুক্ষণ আগে কথা বলেছি ওসির সাথে।’
‘বলুন, থামলেন কেনো? ওসি সাহেব কী বললেন?’
‘তিনি বললেন, সুমির বাবা খুবই ডেঞ্জারাস লোক! অপুকে ফাঁসিয়ে দিতে যে কোনো কিছু করতে পারেন। এমন কী, সুমিকেও তিনি ব্যবহার করতে পারেন অপুর বিরুদ্ধে।’
‘তাই নাকি! স্ট্রেঞ্জ!’
‘হ্যাঁ, ওসি সাহেব আমাকে সর্তক করে দিয়েছেন। আমার খুবই দুঃশ্চিন্তা হচ্ছে।’
‘পুলিশ মামলাটিকে কীভাবে দেখছে?’
‘পুলিশ মামলা কীভাবে দেখছে, সেটা বড় কথা নয়। আমার মনে হলো, ওসি সাহেব প্রকৃত ঘটনা জানেন। কিন্তু তিনি এ ব্যাপারে কোনো সাহায্য করতে পারবেন না বলে জানিয়েছেন। তিনি ভালো একটা উকিল ধরার পরামর্শ দিয়েছেন।’
‘রাবিশ!’
‘কে?’
‘আপনি না, পুলিশ!’
‘ও আচ্ছা।’
‘এখন কী করতে পারি, বলুন তো?’
‘কোনো ক্ষমতাবান লোকের সহযোগিতার প্রয়োজন। পত্রিকায় এ ব্যাপারে একটা নিউজ করিয়ে দিতে পারি। আমার একজন সাংবাদিক বন্ধু আছে...।’
‘না, না। এখনই পত্রিকায় এ সব খবর দেয়া ঠিক হবে না। সুমি বা অপুর ব্যক্তিগত জীবন আরো ক্ষতিগ্রস্থ হবে। তাছাড়া এতে ওদের গোপন বিয়ের খবর ফাঁস হয়ে পড়বে। সাংবাদিকরা কেঁচো খুঁড়তে সাপ বের করে ফেলবেন।’
‘সেটাই তো ভালো। সত্য বেরিয়ে আসবে।’
‘কিন্তু এতে ওদের বিয়েতে আমারা যে স্বাক্ষী হয়েছি, তাও বেরিয়ে আসবে।’
‘তা আসুক। এ তো মিথ্যা নয়।’
‘সব সময় সব সত্যের মুখোমুখি দাঁড়ানো যায় না?’
‘কেনো যাবে না? তা ছাড়া আমার মনে হচ্ছে, ওদের বিয়ের বিষয়টি ফাঁস হয়েই যাবে। মিথ্যা মামলা আর নির্যাতন অপু মেনে নেব কেনো? ও নিশ্চয়ই আদালতে ওদের প্রেম ও

বিয়ের কথা বলবে। তখন প্রমাণও দেখাতে হবে। তাহলে কোনোকিছুই আর গোপন থাকছে না। তাইনা?'
'তা ঠিক। সেরকম হলে হবে। আমরাও তখন স্বাক্ষী দেব।'
'শুনে খুশি হলাম।'
'আপনাকে খুশি করার জন্য এ কথা বলিনি। সে যাকগে, এখন আমাকে একটা পরামর্শ দিন।'
'কী পরামর্শ?'
'আমি আপনার বন্ধু অর্থাৎ আমার ভাইয়াকে ঘটনাটি খুলে বলতে চাই। মামাকে বলতে পারবো না। ভাবীর সাহায্য নিয়ে ভাইয়াকে বলতে পারি।'
'রাশেদকে বলতে চাচ্ছেন?'
'হ্যাঁ, এ মুহূর্তে তার সহযোগিতা পেলে একটা সমাধানের পথ তৈরি হতেও পারে।'
'কীভাবে?'
'বাহ্ রে, আপনিই তো বললেন, কোনো ক্ষমতাবান লোকের সহযোগিতা দরকার।'
'হ্যাঁ, বলেছি।'
'আমার ভাইও তো একজন শিল্পপতি। তারও তো কিছু ক্ষমতা আছে। তাই...।'
'তাইতো! এ কাজটি করতে পারলে ভালোই হবে।'
'তাহলে পরামর্শ দিচ্ছেন?'
'দিচ্ছি।'
'তাহলে আজ রাতেই ভাইয়াকে বলবো।'
'বলো। বিয়ের বিষয়টি ফাঁস হলে পুলিশ আমাদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে। সে জন্য প্রস্তুত থাকা ভালো।'
'ভয় দেখাচ্ছেন?'
'না। সম্ভাবনার কথা বলছি। তুমি কি ভয়কাতুরে?'
'আমি অপবাদকে ভয় পাই।'
'আর নয়তো সাহসী?'
'সাহসের প্রসঙ্গটি আসছে কেনো?'
'জেনে নিতে চাইছি।'
'ও সব জেনে কী হবে?'
'আমি স্বপ্নের একটা খসড়া করছি। তোমাকে যত জানবো, ততই স্বপ্নটা আলোকিত হবে।'
তিথি কোনো কথা বলে না। মৃদুল বলে,
'হ্যালো, হ্যালো, তিথি শুনছো?'
'আপনি এখন কোথায়?'
তিথি নিজের অস্তিত্ব জানান দেয়। যেন ছন্দ ফিরে পায় মৃদুল। বলে,
'আমি এখন গুলশানে। অভিজাত এলাকায় ঘুরছি।'

‘ভর দুপুরে অহেতুক ঘুরছেন কেনো?’
‘কড়া রোদে ঘেমে একটা কবিতা লেখার চেষ্টা করছি।’
টেলিফোনে তিথির হাসির শব্দ ভেসে এলো। ও বললো,
‘শুনেছি, কবিরা রাতের স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় আপ্লুত হয়ে কবিতা লেখেন। আপনি ভরদুপুরে কবিতা লিখছেন?’
‘কী করবো বলো, আমার সহজভাবে কিছু পাওয়া হয়না।’
মৃদুল একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে।
তিথি বলে,
‘সহজ করে কিছু পাওয়ার আনন্দও কম। পেয়ে যাওয়া জিনিসের মূল্যও কমে যায়।’
‘আমি যা চাচ্ছি, তার জন্য অনেক মূল্য দিতে প্রস্তুত আছি। বিশ্বাস করো!’
‘আমার বিশ্বাসে আপনার কী মিলবে?’
‘মিললেও মিলতে পারে, মানিক রতন...!’
মৃদুল কেমন উদাস হয়ে যায়। আসলে তিথির সঙ্গে কথা বলতে ভালো লাগছে ওর। মধুর আবিষ্টতা ছড়িয়ে যাচ্ছে ওর ভেতর থেকে আরো ভেতরে। ও প্রান্ত থেকে তিথি বলে,
‘বুঝতে পারছি আপনার মধ্যে কাব্য সত্ত্বা ভীষণভাবে কাজ করছে। এ ভরদুপুরে কী কবিতা লিখেছেন, বলুন তো!’
‘শুনে রাগ করবে না তো?’
‘রাগ করবো কেনো! আপনি বলুন।’
‘বলতে পারো এটি দুঃসময়ের কবিতা।’
‘আহা! ভূমিকা নয়, কবিতাটি বলুন।’
‘কবিতাটির প্রথম কয়েক লাইন হচ্ছে, ‘ছিলাম যেন অনড় পাথর, তোমায় দেখে হলাম কাতর! পা বাড়ালাম যেই। দেখি, দাঁড়িয়ে তুমি ঠিকই আছো, আমার তুমি নেই।’
‘এ টুকুই?’
‘হ্যাঁ, এটুকুই লিখেছি। খারাপ হয়েছে?’
‘না। তবে আজ আপনার মন যে খারাপ, তা কিন্তু আমি বুঝতে পারছি।’
‘কীভাবে বুঝলে! তুমি কি আমার অন্তর্যামী?’
টেলিফোনে তিথির খিলখিল হাসির ঢেউ এসে পড়লো। মৃদুল তন্ময় হয়ে গেল। তিথি হাসি থামিয়ে বললো,
‘মৃদুল, আমার একটা অনুরোধ রাখবেন?
‘মাত্র একটা অনুরোধ!’
‘হ্যাঁ, মাত্র একটি অনুরোধ লাখলেই খুশি হবো।’
‘বলো, কী অনুরোধ?’

‘আপনি আজ আর ঘুরে বেড়াবেন না। সোজা বাড়ি চলে যান। বাসায় গিয়ে গান শুনতে পারেন, বই পড়তে পারেন। অথবা দীর্ঘ সময়ের জন্য ঘুমিয়ে পড়ুন। অনুরোধটি রাখবেন তো?’

‘রাখবো। কিন্তু বললে না, কী করে বুঝলে আমার মন খারাপ?’

‘শুধু এর উত্তরটা দিতে পারি, যদি আর কোন প্রশ্ন না করেন।’

‘আর প্রশ্ন করবো না। এবার বলো।’

তিথি একটু সময় নিলো। ও বললো,

‘আপনি আজ প্রথম থেকেই আমাকে তুমি সম্বোধন করে কথা বলছেন। এ থেকেই বুঝেছি, আজ আপনার কিছু একটা হয়েছে।’

এ কথায় কেমন লজ্জায় পড়ে গেল মৃদুল। সত্যিই ও তিথিকে তুমি করে কথা বলছে। ও কি অসেচতনভাবে তিথিকে তুমি বলেছে, নাকি অবচেতন মনের দুর্বলতার প্রতিফলন ঘটেছে? প্রশ্নটি ছড়িয়ে গেল ওর মনে। ও দুঃখিত কণ্ঠে বললো,

‘তিথি, এ জন্য আমি দুঃখিত। আপনি কি রাগ করেছেন?’

কোনো জবাব এলো না। ও আবার বললো,

‘হ্যালো, তিথি। আপনি কি রাগ করেছেন?’

‘তা জেনে কী করবেন? আমি ফোন রাখছি।’

‘হ্যালো, হ্যালো..!’

তিথি ফোন রেখে দিল। মৃদুল সদ্য লেখা নিজের কবিতার লাইনগুলো সাজাতে লাগলো ফের। ও এক ধরনের ঘোরের মধ্যে ডুবে গেল। এক সময় বিন্দুকে দেখেও এ ধরনের ঘোরের মধ্যে ডুবে যেত ও। এ তন্ময়তার নাম কি?

১২

রাশেদের অফিস মতিঝিলের সেনাকল্যাণ ভবনের পনের তলায়। এ ভবনে দেশের বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যালয়, ব্যাংক, বীমার কার্যালয় রয়েছে। বাণিজ্যিক মতিঝিলে ব্যস্ততম একটি ভবন। এ ভবনের লিফটের সামনে প্রায়ই দীর্ঘ লাইন দেখা যায়। মৃদুল এ ভবনে আগে কয়েকবার এসেছে। নারায়ণগঞ্জ এলাকার একজন শিল্পপতির অফিস রয়েছে এ ভবনে। ওই শিল্পপতির কাছে চার বছর আগে মৃদুল ওর বন্ধু রুমনের সাথে এসেছিল একটি লিটল ম্যাগাজিনের জন্য বিজ্ঞাপন নিতে। তার অফিসের অভ্যর্থনা কক্ষে দেড় ঘন্টা অপেক্ষার পর ওরা দেখা পেয়েছিল ওই শিল্পপতির। অনেক অনুনয়ের পর বিজ্ঞাপনটি ওরা পেয়েছিল। কিন্তু সেটির বিল আর উদ্ধার করতে পারেনি ওরা। শুধু এ ভবনে যাওয়া-আসাই হয়েছে। এ নিয়ে তিক্ত অভিজ্ঞতা রয়েছে মৃদুলের। আজ অনেকদিন পর সে কথা মনে হলো ওর। মৃদুল লিফট থেকে নেমে রাশেদদের কোম্পানির সাইন দেখে অভ্যর্থনা কক্ষে প্রবেশ করলো। অভ্যর্থনা ডেস্কে একজন তরুণী বসে আছেন। মুখে কৃত্রিম হাসি মাখামাখি । মৃদুল ওই তরুণীর কাছে গিয়ে বললো,

‘আমি আপনাদের এমডি সাহেবের সাথে দেখা করতে চাই। আমার নাম মৃদুল।’
ওর কথা শুনে মেয়েটি যেন তটস্থ হয়ে পড়লো। ও মুখের হাসিটি আরো প্রশস্থ করে মিষ্টি গলায় বললো,
‘স্যার ভেতরে আছেন। আপনি ভেতরে যান। ডান দিকে তার রুম।’
মৃদুল বুঝতে পারলো রাশেদ অভ্যর্থনা ডেস্কে ওর নাম বলে রেখেছিল। নইলে এতো সহজে শিল্পপতিদের রুমে প্রবেশ করা যায় না। মৃদুল অফিসের প্রশস্থ করিডোরে প্রবেশ করলো। এক পলকে দেখে নিলো অফিস জুড়ে থরে থরে সাজানো চেয়ার-টেবিল। তাতে লোকজন কাজে ব্যস্ত। ডানদিকে এগুতেই ও একটি দরজায় ঝুলানো রাশেদের নামের ‘নেমপ্লেট’ দেখতে পেল। ও দরোজার সামনে গিয়ে মৃদু টোকা দিতেই ভেতর থেকে রাশেদ বললো,
‘কাম ইন।’
মৃদুল দরোজা খুলে ঢুকে পড়লো। রাশেদ যেন ওর অপেক্ষাতেই ছিল। ও চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললো,
‘মৃদুল! এসো।! তোমার অপেক্ষাই করছিলাম।’
মৃদুল রাশেদের টেবিলের বিপরীতে ওর মুখোমুখি বসলো। বললো,
‘হঠাৎ আমাকে এমন জরুরি তলব কেনো করেছে, বলোতো!’
রাশেদ মুচকি হাসলো। মৃদুলকে সান্তনা দেবার ভাষায় বললো,
‘আগে একটু দম নিই, বন্ধু। পরে সব বলছি।’
‘না, কাল ফোনে তোমার কণ্ঠে কেমন উদ্বেগ টের পাচ্ছিলাম। তাই...।’
‘কাল রাতে আমি উদ্বিগ্ন নয়, খানিকটা উত্তেজিত ছিলাম। সে কথা শোনার আগে বলো, কী খাবে?’
‘কিছুই খাবো না। সময় নষ্ট না করে আমাকে কেনো ডেকেছো, তা বলো। আমার আরো একটি জরুরি কাজ আছে।’
রাশেদ চুপ হয়ে গেল। মৃদুল ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। রাশেদের মুখ দেখে মনে হচ্ছে ও গুরুত্বপূর্ণ কোনো কথা বলবে। মৃদুল ধীরে ধীরে নিজেকে প্রস্তুত করে নিল। মাত্র কয়েকটা মুহূর্তে বদলে গেল পরিবেশ। রাশেদ বললো,
‘মৃদুল, তুমি আমার বন্ধু। দীর্ঘদিন আমাদের মধ্যে যোগাযোগ না থাকলেও আমরা আবার একে অন্যেকে খুঁজে পেয়েছি। এ জন্য আমি আনন্দিত। আজ তোমাকে ডেকেছি, তোমার বিশেষ সহযোগিতা পাবার আশায়। বলতে পারো, বন্ধু হিসাবে তোমার সহযোগিতা দাবি করছি। তুমি কিন্তু আমাকে ফেরাতে পারবে না!’
মৃদুল এবার মুচকি হাসলো। বললো,
‘রাশেদ, ভুমিকা না করে কী বলতে চাও, বলে ফেলো। বন্ধু হিসাবে তোমাকে সহযোগিতা করার মানসিকতা আমার আছে। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না, তুমি কী সহযোগিতা চাও।’
রাশেদ এবারও কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইলো। এরপর বললো,

'তুমি তো অপুর কথা জানো, তাই না? কাল রাতে তিথি আমাকে সব বলেছে। এরপর থেকে আমি এ ঘটনার সাথে জড়িয়ে গেছি।'

'তাহলে তো ভালোই হলো!'

মৃদুল হাঁফ ছাড়লো। রাশেদ বললো,

'তুমি যা ভাবছো, তা নয়। আমি জড়িয়ে গেছি অন্যভাবে। বলতে পারো বিপরীত দিক থেকে।'

'ঠিক বুঝলাম না।'

মৃদুল প্রশ্নবোধক চোখে তাকিয়ে রইলো রাশেদের মুখের দিকে। রাশেদ ওর চেয়ার থেকে একটু এগিয়ে এলো। বললো,

'তুমি তো জানো, সুমির বাবা মনোয়ার হোসেন দেশের একজন প্রতিষ্ঠিত শিল্পপতি। তার পরিবারের মান-সম্মান রক্ষা করাটা আমারও দায়িত্ব। তাই, আমি মনোয়ার সাহেবকে কথা দিয়েছি তার পক্ষে কাজ করবো। আমি শুনেছি, সুমি ও অপু গোপনে বিয়ে করেছে এবং তুমি ও তিথি ওই বিয়ের স্বাক্ষী হয়েছো। আমি তিথিকে ওর বাবার কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি। এখন তুমি যদি এ ব্যাপারে মাথা না ঘামাও, তাহলে এ সমস্যার সমাধান সহজেই হয়ে যাবে।'

এ পর্যন্ত বলে রাশেদ থামলো। ও মৃদুলের চোখের দিকে চেয়ে রইলো জবাবের আশায়। মৃদুল বললো,

'নিরাপরাধ অপুকে মিথ্যা মামলা থেকে রক্ষা করাটা তোমার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে না?'

'অপুও রক্ষা পাবে। তবে ওকে বা ওর বাবা-মাকে লিখিত দিতে হবে যে, ও আর কোনওদিন সুমির ধারে-কাছে আসবে না। এ শর্তে অপুও ছাড়া পেতে পারে। আমি সেরকম ব্যবস্থা করেছি। আমাকে তুমি বিবেকহীন ভেবো না।'

'তোমার বিবেকটা দেখছি ব্যবসায়িদের মতো লাভ-লোকসানের হিসাব করছে। পথ বের করেছো, নিজের লাভ ঠিক রেখে। তুমি সত্যিই জাত ব্যবসায়ী!'

মৃদুলের বিদ্রুপে রাশেদ লজ্জা পেল না। ও হো হো করে হেসে ওঠলো। হাসি থামার পর বললো,

'তুমি খুবই ইন্টেলিজেন্ট! তুমি ঠিকই ধরেছো, এর মধ্য থেকে আমি নিজের একটা লাভ পেতে যাচ্ছি। তুমি কি জানতে চাও, আমি কী পাবো?'

'বলো।'

'মনোয়ার সাহেব এফবিসিসিআই এর আসন্ন নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট প্রার্থী। তার প্যানেল হচ্ছে খুবই শক্তিশালী। আমি তার প্যানেল থেকে নির্বাচন করার সুযোগ পাবো। এ ছাড়া আমাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ফাইল আটকে আছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে। এ ফাইলটি সচল করে দেবেন বলে কথা দিয়েছেন তিনি। তার ক্ষমতার হাত অনেক বড়!'

'তা বেশ। তোমার লাভ-লোকসান শুনলাম। এবার নির্দিষ্ট করে বলো, আমার কাছে তুমি কী চাও?'

'নীরবতা। তুমি চোখ বন্ধ করে থাকো। তাহলেই হবে।'

‘তিথি কি এসব জানে?’
‘কী সব ?’
‘এই যে তোমার লাভের কথা।’
‘না, না। ওকে তুমিও কিন্তু কিছু বলো না! ওর তো অনার্স ফাইনাল হয়ে গেল। ওকে না হয় কিছুদিনের জন্য ওদের গ্রামের বাড়িতে পাঠিয়ে দেব। আশা করি, এরমধ্যে সব ঝামেলা শেষ হয়ে যাবে।’
রাশেদ স্বস্তি প্রকাশ করলো। ও মৃদুলের দিকে তাকিয়ে নরম গলায় বললো,
‘আমার প্রস্তাবটি মেনে নিতে তোমার কী কোনো আপত্তি আছে? কিংবা তোমার কি কিছু চাওয়া বা বলার আছে?’
মৃদুল একটু ভাবলো। এরপর রাশেদের চোখে চোখ রেখে বললো,
‘দেখো, মনোয়ার সাহেবের হাত কতটা বড় বা ছোট তা জানার আমার দরকার নেই। অপু ও সুমির প্রেম বা বিয়ে নিয়েও আমার মাথা ব্যথা নেই। কিন্তু আমি চাই, অপু জেল থেকে ছাড়া পাক। মিথ্যা মামলায় ওকে জড়ানো হয়েছে, এটা আমি মেনে নিতে পারছি না। যেভাবেই হোক, আমি এ ঘটনার সাথে খানিকটা জড়িয়ে গেছি। তুমি মনোয়ার সাহেবকে বলো, অপু যেন ছাড়া পায়। তা নাহলে অপু বা ওদের পরিবারের কেউ আমাকে ডাকলে ওদের পাশে দাঁড়াবোই। ওদের বিয়ের যে স্বাক্ষী হয়েছি, তা বলতে দ্বিধা করবো না। প্রয়োজনে পত্র-পত্রিকায় এ খবর ফাঁস করে দেব।’
‘বন্ধু, এসব তুমি কী বলছো!’
‘যা বলছি, আমি তা-ই করবো। এতে তোমার কী লাভ-লোকসান হলো, তা ভাববো না।’
‘তাতে তোমার কী লাভ হবে, বলো তো!’
‘এতে আর যাই হোক, বিবেকের আয়নায় মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবো। কোনো গ-ানিতে ভুগবো না। বরং আত্মতৃপ্তিও পেতে পারি।’
মৃদুল জোর দিয়েই কথাগুলো বললো। রাশেদ হতাশ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো ওর মুখের দিকে। ও একেবারেই চুপসে গেল। যেন মৃদুলের এ দৃঢ় জবাবের জন্য ও প্রস্তুত ছিল না। মৃদুল রাশেদের ফ্যাকাশে মুখের দিকে চেয়ে মনে মনে বললো, ‘হায়রে, কোথাকার পানি, কোথায় গড়াচ্ছে!’

রাশেদের অফিস থেকে বের হয়ে মৃদুল সেল ফোনটা অন করলো। সেল ফোন অন করতেই বেজে ওঠলো। ও ফোন ধরলো। ও প্রান্তে তিথি।
‘হ্যালো, সেই কখোন থেকে আপনাকে ফোন করছি। ফোন বন্ধ। আজকের দিনে ফোনটি বন্ধ রেখেছেন কেনো?’
তিথির কণ্ঠে অভিমান। তিথির ফোন পেয়ে মনটা ভালো হয়ে গেল। ও বললো,
‘একটা জরুরি কাজে ব্যস্ত ছিলাম। তাই ফোন বন্ধ ছিল। এখন বলুন কী খবর। হ্যালো...শুনছেন?’

‘খুব ভালো খবর আছে। এ খবর জানানোর জন্যই আপনাকে ফোন করে যাচ্ছি।’
তিথি উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে। মৃদুল বলে,
‘ভালো খবরটি বলে ফেলুন, প্লিজ।’
‘অপুকে ছেড়ে দেয়া হচ্ছে!’
‘তাই নাকি!’
‘হ্যাঁ। রাশেদ ভাই সব ব্যবস্থা করেছেন। সুমির বাবা আদালতে অপুর জামিনে আপত্তি জানাবেন না। দেখলেন, রাশেদ ভাইয়ের সহযোগিতা নিয়ে কত ভালো হয়েছে।’
তিথির কণ্ঠে তৃপ্তির রেশ। মৃদুল বললো,
‘এ খবর শুনে ভালোই লাগছে।’
‘আরেকটি খবর আছে।’
‘বলুন।’
‘আজ সুমি আমাকে ফোন করেছিল! ওর বাবা ওকে অস্ট্রেলিয়া পাঠিয়ে দিয়েছেন। সিডনী থেকে ও আজ ফোন করেছে। অপুর কথা ওকে বললাম।’
‘ও কি বললো?’
‘প্রথমে ও কিছুই বলেনি। ফোনে ওর কান্নার শব্দ পেলাম। পরে ও বললো, ওকে আপাতত নাকি অস্ট্রেলিয়াতেই থাকতে হবে। ওকে বাধ্য হয়েই অস্ট্রেলিয়ায় যেতে হয়েছে। দেশে কবে ফিরতে পারবে ও জানে না।’
‘স্ট্রেঞ্জ!’
‘ওরা কেমন একটা অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে ধাবিত হলো, তাইনা?’
তিথির দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শুনতে পেল মৃদুল। ও সান্তনা দেবার মতো করে বললো,
‘অনেককে ভালোবাসার জন্য চরম মূল্য দিতে হয়। কেউ পোড়ে, কেউ রঙিন ঘুড়ির মতো উড়ে। কেউ পেয়েও হারায়, আবার কেউ হারিয়েও পায়। কেউ কঠিন বিরহে নীল নদী হয়ে যায়, কেউ পাথরেও ফুল ফোঁটায়।’
এ পর্যন্ত বলে মৃদুল থামলো। ও প্রান্তে তিথির খিলখিল হাসির ঢেউ আছরে পড়লো। ও বললো,
‘আপনি দেখছি, ভালোবাসা নিয়ে কাব্যের বিলাসিতা করতে বেশ ভালোই জানেন। লেখকরা ভালোবাসা নিয়ে এতো ভাবে কেনো, বলুন তো?’
প্রশ্নটি ভালো লাগলো মৃদুলের। যেন এমন একটি প্রশ্নের অপেক্ষায় ছিল ও। ওর মনের মধ্যে একখন্ড আবেগ জড়ানো কিছু কথা প্রকাশের পথ খুঁজে ফিরছে। এ মুহূর্তে কথাগুলো আহত পাখির মত ডানা ঝাঁপটাতে লাগলো। ও বললো,
‘কারণ, ভালোবাসা সৃষ্টি করতে শেখায়। ভালোবাসা মনের বিশালত্ব বাড়ায়। ভালোবাসা হচ্ছে আগুন! এ আগুনে পুড়ে যা অবশিষ্ট থাকবে, সেটুকুই খাঁটি!’
স্পষ্ট করে বলা নয়, তবু যেন নিজের কথারই প্রতিফলন। মৃদুল মনে মনে তিথির কাছ থেকে প্রশ্রয় কামনা করছে। কিন্তু তিথিও যেন পাথরের প্রতিমা।

‘হয়েছে, হয়েছে। আপনি আজ কেমন ইমোশনাল হয়ে যাচ্ছেন। সংযত হোন।’
এ কথা বলে তিথি ফের হাসলো। ওর হাসি ভীষণ ভালো লাগছে মৃদুলের। ও কেমন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে।
তিথি বললো,
‘এবার আপনার কথা বলুন। কোথায় আছেন, কেমন আছেন?’
‘আমি শূন্যের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি। স্বপ্নাবিষ্ট হয়ে আছি।’
‘আবারো ইমোশনাল হয়ে যাচ্ছেন!’
‘তবে কী আকাশের এক কোণে কালো মেঘ হয়ে জমে থাকবো? দূরের পাহাড়ের মত বিষণ্ন হয়ে থাকবো? আমার কি ঝর্ণা ধারা হতে ইচ্ছে করে না?’
‘আপনি...আপনি না...!’
‘তিথি, আমি ক্লান্ত পথিক। হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হচ্ছে! স্বপ্নাবিষ্ট হয়ে বসন্তের দরজায় কড়া নাড়ছি। কিন্তু দরজাটা খুলছে না। কেন বলুন তো? আমি কি হতে পারি না বসন্ত পথিক?’
ও প্রান্তে কোন শব্দ নেই। কিন্তু সেল ফোনের লাইন কেটে যায়নি। তিথি এর জবাবে কিছুই বলছে না। কথাগুলো কি ওকে বিব্রত করে দিলো? মৃদুল ডাকলো,
‘হ্যালো, তিথি..., হ্যালো! একটা কিছু বলুন!’
এবার লাইন কেটে দিল তিথি। মৃদুলের মনটা মুহূর্তেই বড্ড খারাপ হয়ে গেল। অন্যরকম খারাপ। মিহিন কষ্টে নীল হয়ে গেল মন। এটাই কি ভালোবাসার কষ্ট?

১৩

অনেকে ভাগ্যে বিশ্বাস করেন। ভাগ্যে বিশ্বাস করেন না কেউ কেউ। মৃদুল ভাগ্যে বিশ্বাস না করার দলের। কিন্তু আজকাল ওর মনে হয়, নিয়তি বলে কিছু একটা আছে। ও দেখেছে, অনেক লেখক অল্পতেই খ্যাতি পেয়েছেন। আবার কেউ কেউ ভালো লিখে সামন্য খ্যাতিও পাননি। চটুল গান গেয়ে কেউ রাতারাতি তারকা শিল্পী হয়ে যাচ্ছে। আবার জাত কণ্ঠশিল্পীর নাম উচ্চারিত হচ্ছে না। কারো শিল্পকর্ম মূল্যায়িত হচ্ছে তার মৃত্যুর পর। এ যেন ভাগ্যের পরিহাস। জীবননান্দ দাশের কথাই বলা যায়। জীবদ্দশায় তার তেমন পরিচিতিই ছিল না। এখন তিনি দু’বাংলার সাহিত্যে উত্তরাধুনিক কবি হিসাবে বিশেষ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত। বিন্দু-শাহেদের বিয়ে এবং অপু-সুমির অপ্রত্যাশিত বিরহকে ভাগ্যের ইঙ্গিত বলে মনে হয় ওর। মৃদুল জানে, দুর্বল চিত্তের লোকেরা ভাগ্যের উপর নির্ভর করে থাকে। নিজেদের ব্যর্থতাকে ভাগ্যের উপর চাপিয়ে দেয়। সাহসীরা ভাগ্য তৈরি করার চেষ্টা করে। মৃদুল লড়াকু মনের হলেও ইদানিং ওর মনে হতাশার কুয়াশা জমে থাকে। বিন্দুর সাথে ওর ভালোবাসার সম্পর্ক হতে গিয়েও না হওয়া এবং ওর প্রতি তিথির উপেক্ষাকে এক করে দেখলে মনে হয়, ওর জীবনে ‘ভালোবাসা’ এক টুকরো প্রহসনের মতো। সব আলোই আলেয়া হয়ে যায়। এ সব কথা ভাবলেই ভাগ্যকে না মানা মৃদুলের শক্ত মনটা ভাগ্যের প্রতি প্রার্থনায় অবনত হয়ে যায়। ভাগ্যদেবীর করুণায় হলেও ও তিথির ভালোবাসা চায়। এ চাওয়ায় ওর কোনো খেদ

নেই, গ্লানি নেই কিংবা এক ফোঁটা সঙ্কোচও নেই। আছে শুধু বুক ভরা আর্তি। অথচ তিথি এর কিছুই জানে না। মৃদুল নিজের রুমে বিছানায় শুয়ে ওই কথাই ভাবছিলো। এ ভাবনার অতল থেকে মনকে তুলে আনতে আনতে ও একটা বড় দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো। ও গত একমাস বাড়ি থেকে খুব একটা বের হয়নি। সবাইকে অবাক করে দিয়ে এক মাস ও নিজের রুমেই কাটিয়ে দিয়েছে। যে ছেলেটি হঠাৎ হঠাৎ কাউকে কিছু না বলে নিরুদ্দেশ হয়ে যায় এবং বাড়িতে থাকলে সাধারণত মধ্যরাতে বাড়ি ফেরে, সে-ই এখন নিজ কক্ষে কাটিয়ে দিয়েছে এক মাস। এ যেন ওর স্বেচ্ছা নির্বাসন। এই একমাস ও শুধু লেখাপড়া করেছে। ও গতকাল বাড়ি থেকে বের হয়েছিল বিসিএস-এর ভাইবা পরীক্ষায় অংশ নিতে। পরীক্ষা দিয়ে সোজা বাড়ি চলে এসেছে। ওর বাড়ি থেকে বের না হওয়ার ঘটনায় ওদের পরিবারের সকলে প্রথম প্রথম ভীষণ খুশি হয়েছিল। এখন সেই খুশি পানসে হয়ে গেছে। বরং ধীরে ধীরে ওর বাবা-মা'র মনে উদ্বেগ তৈরি হচ্ছে। 'মৃদুলের এ আমূল পরিবর্তন কেনো' র জবাব খুঁজছেন ওর মা-বাবা, ভাই-ভাবী। এমনকী ছোট বোন মলিও। নাজমা রায়হান চান ছেলেটা বাড়িতে থাকুক। সংসারী হোক। নিজের কাঁধে দায়িত্ব তুলে নিক। বাউন্ডেলে স্বভাবটা বদলে যাক সংসারের বাস্তব আবহে। মৃদুলের বাড়িতে থাকার ঘটনাটি ওর মায়ের এ ইচ্ছেটাকে আরো প্রবলভাবে নাড়িয়ে দিয়েছিলো। কিন্তু টানা একমাস ওর বাড়িতে থাকাটা চিন্তার মধ্যে ফেলে দিয়েছে তাকে।

মৃদুলের আজ অকারণে মন খারাপ। ও মনের বিষণ্নতা কাটাতে সিডি প্লেয়ার অন করে দিল। মন খারাপ হলেই ও জগজিৎ সিং এর গজল শোনে। সিডি পেয়ারে জগজৎ সিং-এর ভরাট কণ্ঠ সুরের মূর্ছনায় গম গম করে উঠলো। ও বিছানায় শুয়ে সমরেশ মজুমদারের কালবেলা উপন্যাসটি পড়তে লাগলো। এ উপন্যাসটি ওর পছন্দের একটি। ও মাঝে মাঝে এ উপন্যাসের অংশ বিশেষ পাঠ করে। অনিমেষ ও মাধবীলতার প্রেম ওকে ভীষণ টানে। ও বইটির দ্বিতীয় পাতায় আসতেই দরজায় করা নাড়ার শব্দ হলো। ও বুঝতে পারলো মলি রুমে প্রবেশের অনুমতি চাইছে। ও বললো,

'ভেতরে আসতে পারো।'

মলি নয়, রুমে প্রবেশ করলেন নাজমা রায়হান। মাকে দেখে বিছানা থেকে উঠে বসতে গেল মৃদুল। নাজমা রায়হান ছেলের উদ্দেশ্যে বললেন,

'তোকে বিছানা থেকে উঠতে হবে না। শুয়েই থাক।'

মৃদুল বিছানা থেকে উঠলো না। ওর মা এসে বসলো ছেলের মাথার কাছে। মৃদুলের মাথায় হাত রেখে বললো,

'কীরে, এভাবে শুয়ে-বসে কাটিয়ে দিলেই হবে? তোর কি হয়েছে, বলতো?'

মৃদুল এর জবাবে কিছু বললো না। ও জানে, ওর মা ওকে নিয়ে দুঃশ্চিন্তা করছেন। নাজমা রায়হান মৃদুলের মাথায় বিলি কাটতে লাগলেন। মায়ের এ স্নেহ খুব ভালোলাগে ওর। ও বুঝতে পারছে ওর মা আজও অনেক প্রশ্ন করবেন। মৃদুল কিছুক্ষণ দু'চোখ বুজে মায়ের স্নেহের মমতা উপভোগ করতে লাগলো। নাজমা রায়হান নরোম গলায় বললেন,

‘বললি না, তোর কি হয়েছে? পুরো একটা মাস বাড়িতে থাকলি! আমাকে বল, কি হয়েছে।’
‘মা, গত একমাসে এ প্রশ্নটি তুমি প্রতিদিনই করেছে। আমি তো বলেছি, আমার কিছু হয়নি।’
‘তুই বললেই হলো! আমি তোর মা। আমি ঠিকই বুঝতে পাারি তোর কিছু একটা হয়েছে। মায়ের চোখকে ফাঁকি দেওয়া যায় না।’
‘আসলে মা, আমি অনেকদিন বাইরে বাইরে ঘুরেছি। এবার বিশ্রাম নিলাম। আর এ ফাঁকে একটু লেখাপড়া করে বিসিএসটা দিয়ে দিলাম। ব্যাস!’
‘বিসিএস দেবার তোর কি দরকার ছিল? বাবা ও ভাইয়ের সাথে নিজেদের ব্যবসা সামলাবি না?
‘আমাকে দিয়ে ব্যবসা হবে না, মা। লাভ-লোকসানের হিসাবটা আমি ভালো বুঝি না। ব্যবসা তারাই করুক।’
‘ঠিক আছে, আগে না হয় তুই চাকুরিই কর। ভালো না লাগলে পরে ব্যবসায় মন দিবি। এ নিয়ে আমি তোকে কোনো চাপ দিতে চাই না। তবে আমার অন্য কথা আছে।’
‘কি কথা?’
‘কাল, আমি একটি মেয়ে দেখে এসেছি। তোর সাথে ভীষণ মানাবে। তুই এখন মত দে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমি তোকে বিয়ে দেব।’
নাজমা রায়হানের কণ্ঠে ব্যাকুলতা ফুটে উঠে। মৃদুল জানে, ওর মা সেই পুরানো দাবিটিই ওর সামনে তুলবে। ও বললো,
‘তুমি আর আমার জন্য বউ খুঁজো নাতো! আমিই আমার বউ খুঁজে আনবো।’
মৃদুল এ ধরনের কথা আগে কখনো ওর মাকে বলেনি। তাই এ কথায় হেসে ফেললেন নাজমা রায়হান। তিনি বললেন,
‘তাহলে তো খুবই ভালো হয়। আমাকে আর কষ্ট করতে হয়না।’
‘ঠিক আছে, তুমি আর কষ্ট করো না।’
‘তা এনে দে আমার বউ মাকে। এরপর থেকে তোকে আর কিছু বলবো না।’
‘ঠিক আছে, আমাকে কিছুদিন সময় দাও। আগে চাকুরির নিযোগপত্রটা হাতে পাই। তারপর যাব বউ আনতে।’
‘সত্যি বলছিস!’
‘হ্যাঁ, সত্যি বলছি। আর কিছু বলবে?’
‘তা কোথায় থাকে আমার বউ মা?’
‘তা জেনে তোমার কী হবে। তোমার বউমা দরকার, এনে দেব। ব্যাস্।’
‘যদি এ কথা রাখতে না পারিস, তাহলে কিন্তু আমার কথা শুনতে হবে।’
‘কি কথা?’
‘আমি যখন বলবো, বিনাবাক্যে বিয়ের পিঁড়িতে বসতে হবে।’
‘মা, তুমি যে কী! আমার বিয়ে নিয়ে এতো ব্যস্ত হয়ো না তো!’

‘তুমি এ সব কথা বললেই তো হবে না। আমি যে মা!’

‘ঠিক আছে, মা। অপেক্ষা করো, তোমার জন্য পুত্রবধু ধরে আনছি।’

‘আজ আমার প্রাণটা জুড়ালো। তুই শুয়ে থাক। আমি যাচ্ছি। তবে মনে রাখিস, বউ এনে না দিলে কিন্তু আমার কথা রাখতে হবে!’

নাজমা রায়হান হাসি মুখে ছেলের রুম থেকে বের হয়ে গেলেন। তার মন থেকে দুঃশ্চিন্তার পাথরটা যেন সরে যাচ্ছে। মৃদুল ফের কালবেলা’য় মনোনিবেশন করলো। উপন্যাসটি পড়তে পড়তে এক সময় ও নিজেকে অনিমেষ ভেবে তিথিকে মাধবীলতা বানিয়ে নিজের স্বপ্নের রাজ্যে হারিয়ে গেল।

১৪

ফুলপুর গ্রামটির নৈসর্গিক দৃশ্য এমন যে, বাংলাদেশের যে কোনও একটি গ্রামের সাথে এর মিল খুঁজে পাওয়া যাবে। ফসলের মাঠ, একে-বেঁকে বয়ে চলা নদী, সাপ্তাহিক হাঁট ও হাঁটের কলরব, কৃষকের বাড়িতে গরু ও গোয়ালঘর, জেলের মাছ ধরাসহ গ্রামীণ জনপদের চিরচেনা দৃশ্যগুলো এখানে দেখা যায়। তবে এ গ্রামের দুটো দৃশ্যর মিল হয়তো অন্যত্র খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে । একটি দৃশ্য হচ্ছে, এ গ্রামে সন্ধ্যা হলেই প্রতিঘরেই বিদ্যুতের বাতি জ্বলে ওঠে। অপরটি হলো গ্রামের কোনো শিশু কাজ করে না। বা ওরা ঘরে বসেও থাকে না। সবাই স্কুলে যাচ্ছে। পল্লী বিদ্যুতের আওতায় পড়ে গ্রামটির রাতের চেহারা বদলে গেছে। শিশুরা স্কুলগামী হওয়ায় গ্রামের দিনের চেহারাও বদলেছে। আগে দেখা যেত, দরিদ্র পরিবারের শিশুদের কেউ মাঠে বা খেতে কাজ করছে, কেউ মাছ ধরছে, কেউ ঘুরে বেড়াচ্ছে। এখন ওরা প্রতিদিন স্কুলে যাচ্ছে। শিশুদের স্কুলগামী করতে অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মকর্তা মোজাম্মেল হকের অনেক কষ্ট করতে হয়েছে। তিনি বাড়ি বাড়ি ঘুরে শিশুদের নিয়ে এসেছেন নিজের স্কুলে। বুঝিয়েছেন দরিদ্র পিতা-মাতাকে। অর্থ তুলেছেন বিত্তবানদের কাছ থেকে। স্কুলে সম্পৃক্ত করেছেন গ্রামের প্রায় সকলকে। তিনি গত পাঁচ বছর যাবত এ স্কুল নিয়ে পড়ে আছেন। তার স্কুলটি গ্রামে এখন পল্লী বিদ্যুতায়নের মতো শিক্ষার আলো ছড়াচ্ছে। নিজের সততা আর সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে কেউ সামনে এগিয়ে গেলে গন্তব্যে পৌঁছানো কঠিন নয় বলে মনে করেন মোজাম্মেল হক। ফুলপুর গ্রামের দিকে তাকিয়ে তিনি এখন স্বস্থির নিঃশ্বাস ফেলেন। স্কুল প্রতিষ্ঠা করে এবং বিদ্যুতের আলো এনে ফুলপুরকে আলাদা মাত্রা দিতে পেরে তিনি খুশি। মোজাম্মেল হক মনে করেন অন্তত এ দু’কারণে ফুলপুরকে অন্য কোনো গ্রামের তুলনায় আলাদা করা যায়। যদি গ্রামে একটি হাসপাতাল করতে পারতেন, তবে তার প্রত্যাশা পরিপূর্ণতা পেতো। এ নিয়ে তার মনে চাপা আক্ষেপ। মোজাম্মেল হকের মাথায় গ্রামে একটি হাসপাতাল নির্মাণের স্বপ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে। এ স্বপ্নটা শুক্রবার দিন তাকে বেশি করে তাড়া করে। ছুটির দিন বলে স্বপ্নটা বেপরোয়া হয়ে যায়। আজ শুক্রবার। মোজাম্মেল হক চেয়ারে বসে আছেন নিজের বাড়ির উঠানে। তার সামনে

রাখা টেবিলের ওপর একটা পত্রিকা। তিনি পত্রিকা একা পড়েন না। কেউ এলে তিনি পত্রিকা পড়ে শোনান। এতে দুটো কাজ হয়। নিজেরও পড়া হয়। অন্যকেও শোনানো হয়। গ্রামের অধিকাংশ লোক পত্রিকা পড়ে না, বা পড়তে চায় না। দেশের কী অবস্থা বা কী হতে যাচ্ছে এ নিয়ে তাদের যেন মাথা ব্যথা নেই। তাদের অসচেতনতার জন্য সুবিধাবাদীরা কেবল ফায়দা লুটছে। তাই কাউকে পেলেই তিনি পত্রিকার খবর পড়ে শোনান। অন্তত একজন দু'জন লোকও যদি সচেতন হয়ে উঠে, মন্দ কী? কিন্তু আজ এখনো কেউ আসেনি তার বাড়িতে। দুপুরের খাবারের পর তিনি চেয়ার নিয়ে বসেছেন বাড়ির উঠানে। গা ইজি চেয়ারে এলিয়ে দিয়ে চোখ বুজেছিলেন অনেকক্ষণ। চোখ বুজলেই হাসপাতালের স্বপ্নটা কেঁপে কেঁপে ভেসে ওঠে। স্বপ্নটা মাত্র মনে পেখম ছড়াচ্ছিল। কিন্তু ওই মুহূর্তে স্বপ্নটা মিলিয়ে গেল তিথির কথায়।

'বাবা, তুমি রুমে গিয়ে একটু ঘুমিয়ে নিলেই পারতে। সেই কখন থেকে চোখ বন্ধ করে আছো। বাতাস বইছে। তোমার ঠান্ডা লেগে যেতে পারে!'

মোজাম্মেল হকের বয়স হয়েছে। আজকাল অল্প কিছুতেই ঠান্ডা বা সর্দি-জ্বর লেগে যায়। তাই বলে লেপ মুড়িয়ে শুয়ে থাকলে হবে না। মোজাম্মেল হক মেয়ের কথা কানে তুললেন না। তিনি চোখ খুললেন।

তিথি ওর বাবার সামনে রাখা ছোট্ট টেবিলে এক কাপ চা রাখলো। মোজাম্মেল হক মেয়ের চিন্তিত মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন। এরপর চায়ের কাপ তুলে নিলেন। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বললেন,

'তুমি আমার সামনে একটু বসো, মা।'

তিথি একটি চেয়ারে বসলো। বাবার সাথে গল্প করতেই ও এসেছে।

'কিছু বলবে, বাবা?'

তিথি জানতে চায়। মোজাম্মেল হক মাথা নেড়ে হ্যাঁ সূচক সম্মতি জানান। তিথি বলে,

'আগে চা শেষ করো। তারপর কী বলবে, বলো।'

মোজাম্মেল হক চায়ের কাপে ফের চুমুক দিলেন। অনেকে শব্দ করে চা পান করেন। চায়ের কাপে চুমুক দেবার সময় বিশ্রী শব্দ হয়। এটি তিথির ভালো লাগে না। ওর বাবা শব্দ করে চা পান করেন না। এটা তিথির ভালো লাগে। তিথি ওর বাবার উদ্দেশ্যে বললো,

'আজ সারাদিন তুমি একা বাড়িতেই থাকলে। বাইরে ঘুরে আসলেই পারতে।'

'তুই বাড়িতে থাকলে আমার আর বাইরে ঘুরতে ইচ্ছে করে না।'

'আমাকে নিয়ে তুমি কেনো এতো চিন্তা করো, বাবা?'

'না। তোকে নিয়ে চিন্তা করবো কেনো? তাছাড়া চিন্তা করার লোক আমি নই। তবে...!

'তবে কি? থামলে কেনো, বলো?'

'না, বলছিলাম কি..। তোর তো অনার্স শেষ হলো। তাইনা?'

'হ্যাঁ। এখন মাস্টার্স দেব।'

'বলছিলাম কি...। তুই তো ইউনিভার্সিটির হলে থেকেই মাস্টার্স দিতে পারিস, তাইনা?'

বাবার কথা শুনে তিথি ভীষণ অবাক হলো। মোজাম্মেল হক কখনো মেয়েকে হোস্টেলে রেখে পড়াতে চাননি। তাই মামার বাড়িতে থেকে তিথি অনার্স ফাইনাল পর্যন্ত পড়েছে। আজ ওর বাবা এসব কী বলছেন!
তিথি অবাক চোখ তুলে বললো,
'আজ এ কথা বলছো কেনো? আমি তো মামার বাড়িতে ভালোই আছি।'
'তা ঠিক। কিন্তু...?'
'কিন্তু কি? আমাকে খুলে বলো।'
তিথি ওর বাবাকে তাগিদ দেয়। মোজাম্মেল হক বলেন,
'কাল রাশেদের চিঠি পেলাম। ও লিখেছে, তুই যেন আরো কিছুদিন গ্রামে থাকিস। অথচ তোর তো সামনের মাস থেকে মাস্টার্সের ক্লাস শুরু, তাইনা?'
'হ্যাঁ। রাশেদ ভাই কেনো এ চিঠি লিখেছেন?'
'বিস্তারিত কিছু লিখেনি। তবে মনে হচ্ছে, তুই ঢাকায় ফিরে যা, তা ও এ মুহূর্তে চাইছে না।'
'কেনো, বাবা ?'
'এর উত্তর তো আমার জানা নেই। তবে রাশেদের এ পত্রটি আমার ভালো লাগেনি।'
'তুমি কিছু ভেবো না। আমি কাল ঢাকায় ফোন করে জেনে নেব।'
তিথি ওর বাবাকে সান্তনা দিল। কিন্তু ওর মনে একটা অস্বস্তি ভাব ছড়িয়ে যায়। রাশেদ ভাই কেনো এ চিঠি লিখেছে, ও বুঝতে পারছে না। তবে এরমধ্যে যে সুমির কোনো বিষয় আছে, তা আঁচ করতে পারছে। মোজাম্মেল হক আমতা আমতা করতে লাগলেন। তিথি বুঝতে পারছে ওর বাবা আরো কিছু কথা বলতে চায়, কিন্তু বলতে পারছে না। বলার উপায় খুঁজছেন তিনি। তিথি ওর বাবাকে স্বাভাবিক করার জন্য বললো,
'তুমি আর কি বলতে চাও, বলে ফেলো !'
'না, বলছিলাম কি, আমার তো বয়স হয়ে যাচ্ছে। তার ওপর আজকাল আমি এ স্কুল নিয়েই ব্যস্ত হয়ে গেছি। তাই ভাবছিলাম, তোকে বিয়ে দিয়ে দিই।'
এ কথায় তিথি খিলখিল করে হেসে ওঠলো। মোজাম্মেল হক তার মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। হাসি থামার পর ও বললো,
'বাবা, আমার বিয়ে নিয়ে তুমি মাথা ঘামাচ্ছো? কেনো!'
'কেনো, তোর কি বিয়ে হবে না? তুই কি এভাবেই সারা জীবন থাকবি?'
'বাবা, সত্যি করে বলো তো, আজ তুমি আমার বিয়ের কথাই বা কেনো বললে? রাশেদ ভাইয়ের চিঠি পেয়ে তোমার কি মন খারাপ?'
'না, তেমন নয়। আবার সেরকমও।'
'সহজ করে বলো তো, আজ তুমি আমার বিয়ে নিয়ে অতো ভাবছো কেনো?'
তিথি জানে, ওর বাবা সহজে কিছু বলে না। যদি কিছু বলে এর পেছনে কারণ থাকে। তিথি এ কারণটা বের করতে চাইছে। তিথির চাপে পড়ে মোজাম্মেল হক বললেন,

‘তোর জন্য একটা বিয়ের প্রস্তাব এসেছে, তাই। ছেলেটি সবে ডাক্তারি পাশ করেছে। পাশের গ্রামেই ওদের বাড়ি। ঢাকায় থাকে। প্রস্তাবটা পেয়ে ভাবলাম...।
‘বিয়ে দিয়ে মেয়েটাকে পর করে দিই।’
‘দূর, পাগলি! তোকে পর করবো কেনো?’
‘তাহলে আর কখনো আমার বিয়ের কথা বলবে না, বলে রাখছি!’
‘তুই বিয়ের প্রস্তাবটি নিয়ে সিরিয়াসলি ভেবে দেখ। এখুনি আমাকে মতামত জানাতে হবে না। আমি ওদের আমার মতামত পরে জানাবো বলে জানিয়েছি।’
‘বাবা, আমি ঘরে যাচ্ছি। তুমি ওদের যা ইচ্ছে জানিয়ে দিও।’
এ কথা বলেই তিথি চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালো। ও জানে, এ কথা বলার পর ওর বাবা এ নিয়ে আর এগুবেন না। তিথির বিয়ের প্রস্তাব আগেও এসেছে। ওসব প্রস্তাব এক ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছে তিথি। বিয়ের কথা শুনে তিথির মনটা কেমন বিষণ্ন হয়ে গেল। ও পা বাড়ালো ওর রুমের দিকে। পেছন থেকে মোজাম্মেল হক মিষ্টি করে বললেন,
‘তোর কি পছন্দের কেউ আছে, মা?’
প্রশ্নটি ভীষণ কাঁপিয়ে দিল তিথিকে। ওর বাবা এ প্রশ্নটি কখনো ওকে করেননি। আজ কেনো করলেন প্রশ্নটি? এ প্রশ্নে তিথির পা যেন থমকে গেল। প্রশ্নটি শোনার সাথেসাথেই কেনো জানি ওর মনে মৃদুলের মুখটি ভেসে ওঠলো। এতে তিথি নিজেই অবাক হয়ে গেল। এমন তো হবার কথা নয়! কাঁপনটা মনের অন্তপুরে ঢেউ ছড়িয়ে দিল। তিথি ঘুরে দাঁড়িয়ে ওর বাবার উদ্দেশ্যে লজ্জিত কণ্ঠে ছোট্ট করে বললো,
‘আমার অমন কেউ নেই, বাবা!’
এ কথা বলেই ও হনহন করে রুমের ভেতরে প্রবেশ করলো। এ মুহূর্তে ও বাবার কাছ থেকে পালাতে পারলেই বাঁচে।

১৫

ফুলপুর গ্রামটিকে দেখে ভীষণ মুগ্ধ হয়ে গেল মৃদুল। বেশি মুগ্ধ হলো গ্রামের মানুষগুলোর আন্তরিকতা দেখে। ট্রেন স্টেশন থেকে রিকসা নিয়ে বাজার পর্যন্ত আসতে প্রায় তিরিশ জন পথচারী ওকে সালাম দিল। রিকসাচালক বদু মিয়া কেবল অনর্গল কথা বলে যাচ্ছিলো। তার সব কথাই স্কুল মাস্টার মোজাম্মেল হককে নিয়ে। মোজাম্মেল হক যে এ গ্রামের একজন অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তি, তা সহজেই বুঝতে পারলো মৃদুল। ট্রেন স্টেশনে নেমে মোজাম্মেল হকের নাম বলা মাত্রই এগিয়ে এলো রিকসাওয়ালা, হকার, চায়ের দোকানদার, এমনকী স্টেশন মাস্টার। সবাই মৃদুলকে মোজাম্মেল হকের বাড়িতে সানন্দে পৌঁছে দিতে চাইলেন। তিনি ফুলপুর গ্রামবাসীর কাছে কতটা শ্রদ্ধার লোক, তা ট্রেন স্টেশনে নেমে ও বুঝতে পারলো। ও অভিভূত হয়ে গেল। বদু মিয়ার রিকসায় চড়ে রওনা দিল মৃদুল। যাত্রী হিসাবে মৃদুলকে পেয়ে বদু মিয়া খুশিতে আটখানা। রিকসা চলতে লাগলো কখনো পাকা সরু পথে, কখনো ইট বিছানো পথে আবার কখনো মেঠো পথ দিয়ে। বদু মিয়া খুব সাবধানে রিকসা

চালাচ্ছে। যেন সম্মানিত অতিথির কষ্ট না হয়। রাস্তার দু'ধারে ফসলি জমি। চারিদিকে সবুজের সমারোহ। গ্রামের এ শ্যামল স্নিগ্ধ মুগ্ধ করা দৃশ্য মৃদুলের পরিচিত। এ ধরনের অনেক গ্রাম ও ঘুরে বেড়িয়েছে। তারপরও মুগ্ধ হলো ও। গ্রামের সৌন্দর্যে অপার্থিব টান আছে। যতই দেখুক, মন ভরে না। পাঁচ মাইল পথ পেরুবার পর গ্রামের ছোট্ট বাজারে এসে পড়লো রিকসা। মৃদুল বললো,

'বদু মিয়া, রিকসাটা একটু থামান।'

বদু মিয়া রিকসা থামিয়ে ফেললো। ও বললো,

'আমি চা খাবো। আপনি খাবেন?'

'জে না, স্যার। আপনেই খান। নাদের মিয়ার দোকানের চা বাজারের সেরা। চলেন, সেই দোকানে নিয়া যাই।'

এ কথা বলে বদু মিয়া রিকসাটা একটু এগিয়ে নিয়ে থামালো একটি চায়ের স্টলে। চায়ের দোকানে টেপ রেকর্ডে গান বাজছিলো। মমতাজের গান। দোকানের সামনের টুলে তিনজন শ্রমিক শ্রেণীর লোক বসে চা পান করছিলো, আর মনযোগ দিয়ে গান শুনছিলো। বদু মিয়ার রিকশা থামতেই লোক তিনজন টুল থেকে উঠে দাঁড়ালো। মৃদুলকে তারা প্রায় একসাথে সালাম দিল। ও হেসে বিনয় প্রকাশ করলো। বললো,

'আপনারা বসুন। আমি এক কাপ চা খেয়েই চলে যাবো।'

লোকগুলো তবু টুলে বসলো না। বদু মিয়া তাদের উদ্দেশ্যে বললো,

'স্যার, ঢাকা থেইক্যা আইছেন। যাইবেন মোজাম্মেল স্যারের বাড়ি!'

লোক তিনটি যেন আরো সটান হয়ে দাঁড়ালো। মুখের হাসিটা প্রশস্থ হয়ে গেল। নাদের মিয়া দ্রুত তার গামছা দিয়ে টুলটি ঝাড়তে লাগলো। মুখে বিগলিত হাসি ঝুলিয়ে বললো,

'স্যার, বসেন। আপনারে ফাসক্লাস এক কাপ চা খাওয়াইয়া দেই। শহরে গেলেও ভুলবার পারবেন না!'

লোক তিনটি মৃদুলকে আবারো সালাম দিয়ে নিঃশব্দে চলে গেল। মৃদুল টুলে বসলো। বদু মিয়াকে বললো,

'তুমিও বসো। চা খাও।'

'জে, না। আপনে বড় বাড়ির মেহমান! আপনের সামনে বেয়াদবী করলে জিভ খইসা পড়বো!'

এ কথা বলে বদু মিয়া ওর সামনে সঙ্কোচ মুখে দাঁড়িয়ে রইলো। নাদের মিয়া চটপট চা তৈরি ফেলছে। সে কাপটিকে গরম পানি দিয়ে ভালো করে কয়েকবার ধুঁয়ে নিলো। মৃদুল বুঝতে পারলো নাদের মিয়াও তাকে বিশেষ মর্যাদা দিচ্ছে। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে চা তৈরি করে মৃদুলের সামনে হাসিমুখে তা বাড়িয়ে দিল নাদের মিয়া। মৃদুল চায়ের কাপে চুমুক দিল। চা মন্দ হয়নি। কিন্তু চিনি বেশি। হয়তো বিশেষ মর্যাদা প্রকাশ করতে গিয়ে চিনি বেশি দিয়েছে নাদের মিয়া। মৃদুল চায়ের কাপে কয়েক দফা চুমুক দিয়ে বললো,

'সত্যিই, আপনার চায়ের তুলনা হয়না! চমৎকার!'

কথা শুনে নাদের মিয়ার মুখটি উজ্জ্বল হয়ে গেল। যেন বিরাট এক প্রশংসাপত্র সে পেয়ে গেছে। গ্রামের সাধারণ লোকেরা কত সহজেই খুশি হয়ে যায়! এ কথা ভেবে মৃদুলের মনে কেমন বিহ্বলতা ছড়িয়ে যায়। চা শেষ করে দাম দিতে গিয়েও বিপত্তি দেখা দিল। নাদের মিয়া চায়ের দাম নেবে না। মৃদুল বললো,

'চায়ের দাম না নিলে আমি রাগ করবো।'

এর জবাবে নাদের মিয়া নিজের জিভে কামড় দিয়ে বললো,

'আপনে মোজাম্মেল স্যারের অতিথি। আমাগোও মেজবান। আপনের থেইক্যা দাম নেয়াটা পাপ হইবো!'

এ কথায় বিড়ম্বনার মধ্যে পড়ে গেল মৃদুল। চেষ্টা করেও চায়ের দাম দিতে পারলো না ও। নাদের মিয়ার চা পান করে দাম দিতে না পারার অস্বস্থি নিয়ে ফের রিকসায় চড়লো ও। রিকসা চলতে লাগলো। আরো দু'মাইল পথ পেরুবার পর রিকসা এসে থামলো তিথিদের বাড়ির সামনে। ওদের বাড়িটি এল প্যাটার্নের এক তলা দালান। বাড়ির সামনে ছোট্ট একটি গেট। রিকসা থামিয়ে বদু মিয়া বললো,

'স্যার, এইটাই মোজাম্মেল স্যারের বাড়ি।'

মৃদুল রিকশা থেকে নেমে বদু মিয়ার দিকে একশ' টাকার একটি নোট বাড়িয়ে দিল। এতে সে ভীষণ লজ্জায় পড়ে গেল। সে মাথা চুলকে বললো,

'আপনার কাছ থেইক্যা ট্যাকা নিবার পারুম না, স্যার!'

বিস্মিত চোখে বদু মিয়ার দিকে তাকিয়ে রইলো মৃদুল। এ রিকসা শ্রমিক সাত মাইল রিকসা চালিয়ে এসে কী বলছে! মৃদুল বেপরোয়া হয়ে ওঠলো। 'যথেষ্ট হয়েছে!' বলে ও এক রকম জোর করে বদু মিয়ার হাতে টাকাটা গুঁজে দিল। বদু মিয়া 'না, না' করে ওঠলেও মৃদুলের সাথে পারলো না। সে এক ধরনের লজ্জিতভাবে রিকসা নিয়ে চলে গেল। মৃদুল সঙ্কোচ ও দ্বিধা নিয়ে তিথিদের বাড়ির খোলা গেট দিয়ে ঢুকে পড়লো। বাড়িতে ঢুকেই এক অকল্পনীয় দৃশ্য দেখতে পেল ও। তিথি বাড়ির উঠোন ঝাড়ু দিচ্ছে। ওর গায়ে একটি মলিন শাড়ি। শাড়ির আঁচল কোমড়ে গোঁজা। উঠানে ধূলি উড়ছে। দৃশ্যটি ভীষণ ভালো লাগলো মৃদুলের। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ও ছায়ানটের শিক্ষার্থী গ্রামের একটি সাধারণ মেয়ের মত বাড়ির উঠান ঝাড়ু দিচ্ছে, এ দৃশ্য দেখার জন্য প্রস্তুত ছিল না ও। কয়েক সেকেন্ডের বিহ্বলতা। তিথি হঠাৎ মৃদুলকে দেখতে পেল। মৃদুলকে দেখে ও হতভম্ব হয়ে গেল। কয়েকটা মুহুর্ত তিথির মুখে কোনো কথাই ফুটলো না। মৃদুল মিটিমিটি হাসতে লাগলো। তিথি যেন নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছিল না। ও অস্ফূট কণ্ঠে বললো,

'আ-প-নি!'

লজ্জার ভীষণ এক ঢেউ কাঁপিয়ে দিল তিথিকে। হঠাৎ হাতের ঝাড়ু ফেলে ঝড়ের গতিতে ও দৌঁড়ে পালালো নিজের রুমের দিকে। মৃদুল ওর দৌঁড়ে পালানোর দৃশ্যটির উপভোগ করলো। ও বেশ কিছুক্ষণ তন্ময় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো তিথিদের বাড়ির উঠোনে।

সাঁইত্রিশ মিনিট পর তিথি এলো। এ সাঁইত্রিশ মিনিট মৃদুল অপেক্ষার প্রহর গুনছিলো একটি রুমে বসে। রুমটি বৈঠকখানার মতো। তিথি দৌঁড়ে পালিয়ে যাবার পর মাথায় বড় ঘোমটা দেওয়া একজন মহিলা এসে বললো,

'আপনে আসেন, এ রুমে বসেন। আপা আসতাছেন।'

মহিলা রুমটি দেখিয়ে দিলেন। মৃদুল রুমটির ভেতরে ঢুকে পড়লো। রুমটিতে সারি সারি চেয়ার। একটি টেবিল। একটি খাট। একটি আলমারী। মৃদুল টেবিলের সামনের চেয়ারে গিয়ে বসলো। টেবিলে কিছু বই, খাতা ও খবরের কাগজ পড়ে আছে। ঘোমটা মাথার মহিলা কিছুক্ষণ পর টেবিলের ওপর পাটিসাপটা পিঠা ও পানির গাস রেখে গেল। যাবার সময় আবার বললো,

'আপনে অপেক্ষা করেন। আপা আসতাছেন।'

সাঁইত্রিশ মিনিট পর তিথি এলো। এবার অন্য বেশে। ও পড়েছে সালোয়ার-কামিজ। চুল বেঁধেছে। কপালে নীল টিপ। অপূর্ব লাগছে ওকে। কিছুক্ষণ আগে দেখা তিথির সাথে এ তিথির যেন মিল নেই। তিথি এসে বসলো টেবিলের অপরপ্রান্তে রাখা চেয়ারে, মৃদুলের মুখোমুখি। ওর চোখে মুখে লজ্জার রেশ লেগে আছে। মৃদুল আজ প্রস্তুত হয়েই এসেছে। ও আজ সব লজ্জা ভেঙে দিতে চায়। অপ্রকাশের দেয়ালটা ভেঙে ফেলতে চায়। ও আজ হাত বাড়িয়ে তিথির হাত ধরতে চায়। মৃদুলের ভেতরে এ ধরনের প্রস্তুতি তোলপাড় করছে। তিথি মিষ্টি কণ্ঠে বললো,

'কেমন আছেন?'

'ভালো নেই।'

মৃদুল অকপটে সত্য স্বীকার করে।

'কেনো? কী হয়েছে?'

তিথি চোখ রাখে মৃদুলের চোখে। মৃদুল বলে,

'তেমন কিছু হয়নি। একটা মানসিক কষ্টের মধ্যে ছিলাম।'

'কেনো?'

'আপনার জন্য।'

'আমার জন্য!'

'হ্যাঁ। আপনি গ্রামে চলে আসলেন। আমাকে একটা ফোন করলে কী এমন হতো, বলুন তো?'

তিথি এর কোনও জবাব দিল না। ও মৃদুলের দৃষ্টি থেকে নিজের দৃষ্টি সরিয়ে নিল। মৃদুল বললো,

'বললেন না, ফোন করেন নি কেনো?'

'এর জন্য কষ্ট পেয়েছেন!'

তিথির বিস্ময় মিশ্রিত প্রশ্নের জবাব দিল না মৃদুল। অভিমানেরও নিজস্ব একটা ভাষা আছে। মৃদুল কথা না বললেও সে ভাষাটা কথা বলছে। তিথি দুঃখিত গলায় বললো,

'এ জন্য আমি সত্যিই দুঃখিত। আপনাকে বলে আসাটা ভদ্রতার মধ্যে পড়ে। আমি..।'
'শুধুই কি ভদ্রতার কথা বলছেন!'
এ প্রশ্নের জবাব দিল না তিথি। ও মাথা নিচু করলো। মৃদুল বললো,
'প্রায় দেড় মাস হয়ে গেল ঢাকা ছেড়েছেন। একটা ফোনও করেননি। আমার ওপর কী, কোনও কারণে আপনি রেগে আছেন?'
'এ প্রশ্নটার জবাব জানার জন্যেই কী এতদূর এসেছেন?'
তিথির এ প্রশ্নের জবাব না দিয়ে মৃদুল বললো,
'আমাকে উপেক্ষা করে কী আপনি আনন্দ পান?'
এ কথায় তিথি মিষ্টি করে হাসলো। বললো,
'আপনি আমার ওপর খুব রেগে আছেন, দেখছি! আমি তো 'সরি' বলেছি।'
মৃদুল কিছু বললো না। অভিমানটাই ঠোঁট ফুলিয়ে ওঠে। তিথি ফের বললো,
'আপনি এখন বিশ্রাম নিন। বাবাকে খবর পাঠিয়েছি। তিনি চলে আসবেন। পরে না হয় কথা হবে।'
তিথির এ কথায় রাগ, অভিমান ও কষ্ট মৃদুলের ভেতর একসাথে কঁকিয়ে ওঠলো। ও বললো,
'আপনার বাবা আসার আগে, আপনার সাথে আমি সিরিয়াস কিছু কথা বলতে চাই।'
'বলুন। কী বলতে চান।'
তিথি সম্মতি জানায়। মৃদুল একটু সময় নিয়ে বললো,
'তিথি, আমি আমার মাকে কথা দিয়ে এসেছি যে, তার জন্য পুত্রবধূ নিয়ে যাবো।'
মৃদুলের এ কথা শুনে তিথির শরীরটা যেন কেঁপে ওঠলো। ও মাথা নিচু করে ফেললো ফের। মৃদুল বললো,
'আপনি কি আমার কথা শুনছেন? আমি আমার মাকে কথা দিয়ে এসেছি।'
তিথি এর কোনো জবাব দিল না। মৃদুল আজ সময় নষ্ট করতে চায় না। ও স্পষ্ট হতে চায়। মনের কথাটি সরাসরি বলে ফেলতে চায়। ও বললো,
'তিথি, আজ আপনাকে একটা কথা সরাসরি বলতে চাই।'
'কথাটি বলবেন না, প্লিজ! আমি জানি, আপনি কী বলতে চান।'
তিথির কণ্ঠ কাঁপছে। মৃদুলের ভেতরের ঝড়টা কেমন বেপরোয়া হয়ে ওঠছে। ও নিজেকে সংযত করে বললো,
'আমি এসেছি, আপনার বাবার কাছে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে। আমি আপনাকে বিয়ে করতে চাই।'
তিথি দু'হাতে নিজের কান চেপে ধরলো। আর্তনাদের কণ্ঠে বললো,
'প্লিজ, ওসব বলবেন না, প্লিজ!'
মৃদুল আরো কিছু বলতে যাচ্ছিলো। তিথির মুখের দিকে তাকিয়ে থেমে গেল। তিথির দু'চোখ বেয়ে অশ্রুধারা নেমে আসছে। মৃদুল আর কিছুই বলতে পারলো না। তিথি নীরবে

কাঁদতে লাগলো। ওর কান্নার সামনে কেমন চুপসে গেল মৃদুল। ও বুঝতে পারছে না তিথি কেনো কাঁদছে।
এ ধরনের পরিস্থিতির মুখোমুখি কখনো পড়েনি মৃদুল। ও অপরাধীর মত মাথা নিচু করে রইলো। তিথিকে কাঁদিয়ে দেবার জন্য তো ও আসেনি। ও ভেবে পাচ্ছে না এখন ও কী করবে। আর কীইবা বলবে। যা বলার তা বলে ফেলেছে। এখন ও শুনতে চায়। বেশ কিছুক্ষণ ও মাথা নিচু করে রাখলো। তিথিও নতমুখী। তিথি মুখ তুললো এক সময়। বললো,
'মৃদুল সাহেব, আপনার-আমার পরিচয়টা অল্পদিনের। এ টুকু সময়ে আপনি আমার সম্পর্কে কী জেনেছেন, জানি না। হুট করে এতদূর ভেবে বসাটা আপনার ঠিক হয়নি।'
'আমার ভুলটা যে কোথায়, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।'
কৈফিয়ত দেয় মৃদুল। তিথি বলে,
'আপনি আমাকে বিয়ে করতে চাইছেন কেনো?'
'কারণ, আপনাকে আমি ভালোবেসে ফেলেছি। এটা নিশ্চয়ই আপনিও বুঝতে পেরেছেন?'
'কিন্তু, তা হয়না!'
'কেনো? আমি কি আপনার যোগ্য নই? তিথি, আপনি আমাকে দায়িত্বশীল হতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। বিশ্বাস করুন, এরপর থেকে আমি বাউন্ডেলে স্বভাবটা বদলে ফেলেছি। আমি, আমি বিসিএস পরীক্ষা দিয়ে একটা চাকরি পর্যন্ত জোগার করেছি। যা করেছি, সব আপনার জন্য। আমি আজ নিজেকে যোগ্য করেই এসেছি। যদি শূন্য হাতে ফিরে যেতে হয়, তাহলে বলুন আমার অযোগ্যতা কোথায়?'
মৃদুলের কণ্ঠ কেমন বিমর্ষ হয়ে ওঠে। তিথি শান্ত গলায় বলে,
'আপনার যোগ্যতা নিয়ে আমার প্রশ্ন নেই। আমার জন্য আপনি যা করেছেন, তার জন্য আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। কিন্তু...!'
'কিন্তু কী, বলুন?'
মৃদুল ব্যাকুল হয়ে ওঠে। তিথি একটু সময় নিয়ে বলে,
'এ কথা শুনলে আপনি কষ্ট পাবেন।'
'আমি এমনিতেই কষ্ট পাচ্ছি। যা বলতে দ্বিধা করছেন, বলে ফেলুন, প্লিজ! আমি আজ যে কোনো কষ্টের জন্য প্রস্তুত।'
'মৃদুল সাহেব, আপনি যে তিথিকে দেখছেন। আমি সেই তিথি নই। দু'বছর আগে আমার বিয়ে হয়েছিলো। বিয়ের দু'মাস পর এক সড়ক দুর্ঘটনায় আমার স্বামী মারা যান।'
এ টুকুই বলে থেমে গেল তিথি। মৃদুল কোনো কথাই বললো না বা বলতে পারলো না। নদীর তীর ভাঙার মত ওর ভেতরটা ভাঙছে। ও কষ্টের কুয়াশা থেকে আরো গভীর অতলে হারিয়ে যেতে থাকলো। মুহূর্তগুলো নৈঃশব্দ্যের তানপুরায় গলা সাধছে। তিথি ফের বললো,

‘আমি জানি, এ কথা শোনার পর আপনি কষ্ট পাচ্ছেন। কিন্তু আমি এ কথা আপনাকে বলার সুযোগ পাইনি। বা বলার প্রয়োজন বোধ করিনি। আজ আপনি বিয়ের প্রস্তাব দেয়ায় এ কথা বলতে হলো। আপনার কষ্টের কারণ হয়েছি বলে আমাকে ক্ষমা করে দেবেন। প্লিজ!’

তিথি ফের ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠলো। মৃদুল তিথির অশ্রুভেজা মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ। একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললো,

‘সব জানার পরও যদি আপনাকে বিয়ে করতে চাই?’

কথাটি ভীষণ নাড়িয়ে দিল তিথিকে। ও হকচকিয়ে গেল। ফ্যালফ্যাল করে তাকলো মৃদুলের দিকে।

মৃদুল আবারও বললো,

‘যদি তারপরও আপনাকে বিয়ে করতে চাই, রাজী হবেন?’

‘কেনো করুণা করতে চাইছেন?’

মাথা নিচু করে জানতে চাইলো তিথি। মৃদুল বললো,

‘আপনি ভুল ভাবছেন। আপনাকে করুণা করার মত আমার কিছুই নেই। যার কিছু নেই, সে কাউকে করুণা দেখাতে পারে না। আমি সেদিক থেকে একজন নিঃস্ব-রিক্ত মানুষ। ভালোবাসা ছাড়া আমার অবশিষ্ট কিছু নেই। সে ভালোবাসাটুকুই আপনাকে উজাড় করে দিতে চাই। আপনার সব কষ্টের ভার তুলে নিতে চাই।’

‘কিন্তু, কেনো!’

‘এ কেনোর সঠিক জবাবটা আমার জানা নেই। শুধু জানি, ভালোবাসা মনকে বিশাল করে।’

‘মৃদুল,প্লিজ! ওভাবে বলবেন না!’

‘আমার প্রতি কি আপনি বিশ্বাস রাখতে পারছেন না? কথা দিচ্ছি, আপনাকে কখনো অসম্মানিত করবো না। বিয়েতে মত দিন, প্লিজ!’

তিথি কোনো জবাব দিল না। মৃদুল ওর জবাবের অপেক্ষা করছে। ওর মন থেকে কষ্টের মেঘ একটু একটু করে সরে যাচ্ছে। মৃদুল তাগিদ দিয়ে বললো,

‘আপনার বাবা আসার আগে আপনার মতামতটা জানতে চাই। আপনি মত না দিলে আমি এখান থেকেই ফিরে যাবো। কথা দিচ্ছি, আমি আপনাকে আর কখনো বিরক্ত করবো না।’

‘আপনি ফিরে যান, প্লিজ!’

এ কথা বলেই ওঠে দাঁড়ালো তিথি। মৃদুলকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই ও হনহন করে রুম থেকে বেরিয়ে গেল। মৃদুল হতভম্বের মত তাকিয়ে রইলো তিথির চলে যাওয়ার পথের দিকে। দপ করে ওর আশার আলোটা নিভে গেল। ও কিছুক্ষণ নিঃশব্দে বসে রইলো। এ সময়টুকুতে ওর পৃথিবীতে যেন ভুমিকম্প হয়ে যাচ্ছে। এক সময় ও একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে টেবিলে রাখা খাতার পৃষ্ঠায় তিথির উদ্দেশ্যে চিঠি লিখলো।

‘তিথি,

ছিলাম বিষণ্ন পথিক। আপনাকে ভালোবেসে হতে চেয়েছিলাম বসন্ত পথিক। হতে পারলাম না। কারণ, আজ নিয়তির সঙ্গে হেরে গেলাম। বিশ্বাস করুন, আমি হেরে যেতে চাইনা! নিয়তিকে না মানলেও আজ স্বীকার করছি, নিয়তি যেমন আছে, তেমনি আছে এর পরিহাস। নিয়তি আমার সঙ্গে পরিহাস করতেই যেন পছন্দ করে। আজও পরিহাসের শিকার হলাম। তারপরও নিয়তিকে জয় করার ইচ্ছাটাকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেলাম। যদি কখনো আমাকে জয়ী করিয়ে দিতে আপনার ইচ্ছে হয়, জানাবেন। আমি আপনার অপেক্ষায় থাকবো। ভালো থাকুন।
-মৃদুল

চিঠিটি লিখে মৃদুল ঝড়ের গতিতে বেরিয়ে এলো রুম থেকে। তিথিদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে ও উদভ্রান্তের মত হাঁটতে লাগলো। ওর দু'চোখ যেন ভারী হয়ে আসছে। দম নিতে কষ্ট হচ্ছে। পা চলছে না। হাঁটতে গিয়ে ও টলছে। এ মুহূর্তে হাউমাউ করে ওর কাঁদতে ইচ্ছে করছে। ও নিজেকে সামলে রাখলো। কিছুক্ষণ আগেও আজকের দিনটিকে এবং এ গ্রামটিকে খুউব সুন্দর লাগছিল ওর। এখন সবকিছুই ওর কাছে কেমন বিষদৃশ্যের মত লাগছে!

১৬

মলির ডাকে ঘুম ভাঙ্গলো মৃদুলের। সকালটা বেড়ে কড়া রোদের কাছিকাছি। জানালা গলে সেই রোদ এসে পড়েছে বিছানায়। মৃদুল শেষ রাতে বাড়ি ফিরেছিল। মলির ডাকে ঘুম ঘুম চোখে তাকালো ও।
'ছোটদা, আর ঘুমাতে হবে না। তাড়াতাড়ি ওঠো!'
'আহ্, এমন করছিস কেনো? আমি আরো ঘুমাবো। তুই যা তো!'
মৃদুল বিরক্তি প্রকাশ করে।
'ছোটদা, তোমাকে এখন উঠতেই হবে। বাড়িতে ভয়াবহ একটা ব্যাপার ঘটতে যাচ্ছে! তুমি ঘুমিয়ে থাকলে তো হবে না!'
মৃদুল জানে মলি ওর সাথে অনেক সময় ফান করে। ও মলির কথায় গা করলো না। বললো,
'তুই যা তো! বিরক্ত করিসনে। আমাকে ঘুমোতে দে।'
'আহ্া! তুমি যে কী! বললাম না বাড়িতে একটা ভয়াবহ কান্ড ঘটতে যাচ্ছে!'
এবার মৃদুল মলির প্রতি ভীষণ বিরক্ত হলো। বললো,
'বাড়িতে মহাপ্রলয় হলেও আমি এখন ঘুমাবো। আমাকে বিরক্ত করিসনে।'
'তুমি ঘুমালে যে প্রলয়ও হবে না, সৃষ্টিও হবে না!'
মৃদুল বুঝতে পারলো মলির উপদ্রব থেকে ওর নিস্তার নেই। আদরের ছোট বোন বলে মাঝেমাঝে মলির উপদ্রব মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। মৃদুল বিছানায় উঠে বসলো। বললো,
'বল, কী মহাকান্ড হতে যাচ্ছে?'
'হি-হি-হি।'

মলি মৃদুলের দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগলো।
‘তুই আমার দিকে তাকিয়ে হাসছিস কেনো!’
‘ছোটদা, তুমি কি কোনো শব্দ শুনতে পাচ্ছো না!’
মলির কথায় মৃদুল ইন্দ্রিয় শক্তি সর্তক করলো। একটা চাপা কান্নার আওয়াজ ও শুনতে পেল। আওয়াজটা বাড়ির ভেতর থেকে আসছে। ও বললো,
‘কে কাঁদছে বলতো! কেনো কাঁদছে?’
মলি হাসির দমকায় ফেটে পড়লো। মৃদুল ওর ছোট বোনের এ প্রাণখোলা হাসিটা খুব পছন্দ করে। ও মলির হাসিভরা মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। হাসি থামার পর মলি বললো,
‘ছোট দা, বাড়িতে কেউ কাঁদছে না। বাড়িতে সানাই বাজছে!’
‘সানাই!’
‘হ্যাঁ, সানাই!
‘সানাই বাজছে কেনো?’
‘আজ তোমার বিয়ে!’
বলেই মলি হাসতে লাগলো। মৃদুল অবাক চোখ তুলে তাকিয়ে রইলো মলির দিকে। নিজের ইন্দ্রিয় শক্তি আরো বেশি করে কাজ করছে বলে ও সানাইয়ের সুরটা ভালো করে শুনতে পেল। সানাইয়ের সুর কেনো বাজছে ও বুঝতে পারলো না। মলি যা বলছে, তা সত্যি হবারও নয়। মৃদুলের বিয়ে হবে, আর ও জানবে না-এমন হবার নয়। হঠাৎ ঘুম থেকে উঠেই বিয়ের পিঁড়িতে কেউ বসেছে বলে ওর জানা নেই। কিন্তু মলির খুশি খুশি ভাবে মনে হচ্ছে বাড়িতে কিছু একটা হতে যাচ্ছে। ও বললো,
‘লক্ষীবোন আমার, সত্যি করে বলতো, বাড়িতে সানাই বাজছে কেনো?’
‘আমি সত্যি বলছি, আজ তোমার বিয়ে! হঠাৎ করেই এ আয়োজন।’
‘আমার বিয়ে আর আমি জানবো না! আমার সাথে মশকরা করা হচ্ছে, না?’
‘ছোটদা, সত্যি করে বলছি, আজ তোমার বিয়ে। তাইতো তোমাকে ঘুম থেকে তুলতে এলাম। হি-হি-হি।’
এবার কেঁপে উঠলো মৃদুল। আশঙ্কার মেঘ ছড়িয়ে গেল মনে। মুহূর্তেই ঘুম উবে গেল। ও চিৎকার করে ডাকলো,
‘মা!’
ওর মা যেন দরোজার পাশেই ছিলেন। তিনি মৃদুলের রুমে ঢুকলেন। বললেন,
‘এমন ষাঁড়ের মতো চেঁচাচ্ছিস কেনো?’
‘মা, বাড়িতে সানাই বাজছে কেনো? মলি কী যা তা বলছে!’
‘ও যা তা বলতে যাবে কেনো? ও যা বলেছে, সত্যিই বলেছে।’
বিস্ময়ের আরেকটা ধাক্কা এসে লাগলো। ও বললো,
‘তুমি এসব কী বলছো! আজ আমার বিয়ে!’
‘হ্যাঁ। তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নে।’

‘মা, তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে!’
‘তুই আমার মাথা কখনো ঠিক থাকতে দিয়েছিস?’
‘মা! আমি কি বলেছি যে, বিয়ে করবো। তোমরা কার সাথে আমার বিয়ে ঠিক করলে! আমি তো কিছুই জানি না! শেষ রাতে এসে ঘুমালাম, সকালে শুনছি আমার বিয়ে! এ রহস্যের কারণ কি?
এর জবাব দিল মৃদুলের ভাবী নীতা। সে মৃদুলের রুমে প্রবেশ করার সময় বললো,
‘তুমি যে সব সময় রহস্য করতে পছন্দ করো, তাই এ রহস্যের আয়োজন।’
‘ভাবী!’
নাজমা রায়হান নীতার উদ্দেশে বললেন,
‘বউমা তুমি ওকে তৈরি হতে বলো, আমি অন্যদিকটা সামলাচ্ছি।’
তিনি বেরিয়ে গেলেন। মলিও চলে গেল তার সাথে। মৃদুল ওর ভাবীর দিকে তাকিয়ে অসহায় গলায় বললো,
‘ভাবী, সত্যি করে বলো তো, মা যা বললেন তা সত্যি কিনা?’
‘হ্যাঁ, মাত্র কয়েক ঘণ্টা সময় আছে, তুমি তৈরি হয়ে নাও।’
‘বুঝেছি, তোমরা কোনো ষড়যন্ত্র করছো। বাবা ও ভাইয়া কোথায়? আমাকে তাদের সঙ্গে কথা বলতে হবে।’
মৃদুলের কথায় মিটিমিটি হাসতে লাগলো নীতা। বললো,
‘তারা বাইরে গেছেন বিয়ের জরুরি কিছু কেনাকাটার জন্য।’
‘উফ্, ভাবী! আজকের দিনটা যে কীভাবে শুরু হলো! আমি যেন পরিহাসের পাত্র হয়ে গেলাম!’
নীতা রসিকতার সুরে বললো,
‘বিয়েতো একদিন না একদিন তোমাকে করতেই হবে। তা আজকে করলে দোষটা কোথায়, শুনি?
‘ভাবী, আমি কোনওদিন বিয়ে করবো না। আজকেও না।’
‘তাই নাকি! কেনো?’
‘সবসময় সব কেনোর জবাব দেওয়া যায় না।’
‘এর জবাব আমাকে না দিলেও যাকে বিয়ে করতে যাচ্ছো, তাকে কিন্তু দিতে হবে!’
‘তাকে আমার মুন্ডু দেবো! দাঁড়াও আমি পালাচ্ছি! দেখি, আমাকে বিয়ে দেয় কে?’
বলেই বিছানা থেকে লাফিয়ে নামলো মৃদুল। ভয় পেয়ে নীতা বললো,
‘দাঁড়াও, দাঁড়াও, পালাতে হবে না। তিথিকে বলছি, তুমি বিয়েতে রাজী নও। জোর করে কি, কাউকে বিয়ে দেওয়া যায়!’
তিথির নাম শোনা মাত্রই মৃদুল থমকে গেল। একটা আর্তস্বর ওর কণ্ঠ পর্যন্ত ওঠে আটকে গেল। মুখ দিয়ে কোনো কথা বেরোল না। বিস্ময় থেকে আরো গভীর বিস্ময়ে তলিয়ে যেতে থাকে ও। নীতা ওর ফ্যাকাশে মুখের দিকে তাকিয়ে ফোঁড়ণ কেটে বললো,

‘বাহ্, নামটি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই দেখছি, দেবর আমার কেমন মূর্তি হয়ে গেল! বলছিলাম কী, তিথিকে এখন কি বলবো? তোমার জবাবটা এখনই জানতে চাই।’
মৃদুল সীমাহীন অতল এক রহস্যের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। ওর চিন্তা শক্তিও থমকে গেছে। ও বোকার মতো চেয়েই রইলো নীতার মুখের দিকে।
‘এমন ভ্যাবলাকান্তের মতো চেয়ে আছো কেনো? জবাব দাও। জবাব হ্যাঁ হলে আমাকে এখুনি বিয়ের সব আয়োজন সম্পন্ন করতে হবে।’
‘ভাবী, আমি তোমার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না। তিথির কথা তুমি জানো কি করে! ওর সাথে আমার বিয়েও বা হবে কি করে!’
‘তোমার কাছ থেকে কি আর ওর কথা জানতে পেরেছি? ও আজ সকালে নিজে এসেই সব জানালো।’
‘তিথি এখানে! আই মিন, আমাদের বাড়িতে!’
‘হ্যাঁ। কেনো সে কি আসতে পারে না?’
‘ও কোথায়!’
‘বাহ্, ওকে দেখার জন্য দেখছি মরিয়া হয়ে গেলে! তা বিয়ের আয়োজন তাহলে করবো?’
‘ভাবী, তোমার যা ইচ্ছা করো। আমি তিথির সাথে কথা বলতে চাই।’
এ সময় তিথি মৃদুলের রুমে ঢুকলো। ওর পেছনে মলি। মৃদুলের বিস্ময় বোধ যেন লোপ পেয়ে গেছে। তিথির দৃষ্টি অবনত। মৃদুল তিথিকে দেখে বাকরুদ্ধ। নীতা বললো,
‘কনের সাথে কথা বলে নাও। তোমার ভাই কাজী আনতে গেছেন। আজ দুপুরেই তোমাদের বিয়ে।’
এ কথা বলে নীতা মলিকে নিয়ে চলে গেল। যাবার সময় রুমের দরোজাটা বন্ধ করে দিয়ে গেল সে।
তিথি দাঁড়িয়ে আছে অনেকটা অপরাধীর মতো। চোখ তুলে তাকাচ্ছে না। মৃদুল অন্য সময় হলে লুঙ্গি আর টি শার্ট পড়ে থাকার জন্য সঙ্কোচবোধ করতো। এ ধরনের পোশাকে ও কখনো তিথির সামনে দাঁড়ায়নি। কিন্তু এখন ওসব নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় নেই। মৃদুল ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হলো। একটু দম নিয়ে বললো,
‘তিথি, আপনি আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন, এ যেন স্বপ্নের মতো লাগছে! আমি কি স্বপ্ন দেখছি?’
‘না।’
জবাব দিল তিথি।
‘কিন্তু সেদিন যে আমাকে ফিরিয়ে দিলেন!’
‘আপনাকে ফেরাতে পারলেও নিজেকে ফেরাতে পারিনি। তাই তো চলে এলাম।’
‘কীভাবে এলেন?’
‘বাহ্ রে, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া একজন মেয়ে বুঝি একা আসতে পারে না! তবে আমি আমার বাবাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছি।’

‘তাই নাকি! তিনি কোথায়?’
‘বাবা আপনাদের ড্রইংরুমে বসে খবরের কাগজ পড়ছেন।’
‘তা বাড়িতে এসে কি বললেন?’
‘প্রথমে আপনার মা-বাবাকে সালাম করলাম। তারা তো আমাকে দেখে অবাক। আপনার ভাবীকে বললাম, ‘আমি মৃদুলের বউ’। তার মনে দ্বন্দ্ব ছিল। তাই আপনার লেখা পত্রটা তাকে দেখালাম। ব্যাস, এতেই কাজ হলো।’
‘আমার কাছে অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে!’
‘আপনি খুশি হয়েছেন?’
‘অ-নে-ক! আমার ঘোর কাটছে না! আচ্ছা,আপনি কি আমার মা-ভাবীকে আপনার আগের বিয়ের কথাও বলেছেন?’
এ প্রশ্নে খিলখিলিয়ে হেসে উঠলো তিথি। হাসির ঢেউ ছড়িয়ে পড়লো ওর সর্বাঙ্গে। মৃদুল ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো। তিথি বললো,
‘বুদ্ধু, আমার আগে বিয়ে হয়নি!’
‘সেদিন যে বললেন!’
‘আপনাকে পরখ করার জন্য ও কথা বলেছিলাম।’
‘আশ্চার্য! কেনো!’
বিস্ময় প্রকাশ করে মৃদুল। তিথি এ প্রশ্নের অপেক্ষায়ই ছিল। ও কৈফিয়ত দিতে চায়। ও বললো,
‘আপনার আমার পরিচয়টা অল্প সময়ের। এ সময়ের মধ্যে আমরা যতটুকু মেলামেশা করেছি, তাতে একে-অন্যেকে সবটুকু জানা যায় না। মানুষ হিসাবে আপনি কেমন, চিন্তায় কতটা আধুনিক, চেতনার দিক থেকে কতটা মানবিকতা সম্পন্ন, ভালোবাসার জন্য কতটা বিশ্বস্থ, নির্ভর করার মতো কতটা দায়িত্ববান- তা বোঝার সুযোগ নেই। তাই আপনি যখন ভালোবাসার দাবি নিয়ে আমাকে জীবন সঙ্গী করার জন্য হাত বাড়ালেন, তখন আমার শরীর ও আত্মা অপ্রার্থিব আনন্দে কেঁপে উঠেছিলো। কিন্তু সে সময় আমি আমার আবেগকে সংযত রেখেছি। কেনো জানি, তখন আপনাকে ভালো করে জানবার সাধ হলো। আপনার মনের উদারতা পরখ করার ইচ্ছে হলো। তাই মিথ্যে করে বলেছিলাম যে, আমার বিয়ে হয়েছিলো।’
তিথির কথা শুনে কেমন হতভম্ব হয়ে গেল মৃদুল। কতটা কষ্টের আগুনে ও পুড়েছে, পুড়ে পুড়ে খাঁক হয়েছে-তা কি তিথি জানে? মৃদুল বললো,
‘চমৎকার! গল্পকারের সাথেই গল্পের ফাঁদ!’
‘জ্বি, জনাব।’
তিথি মুচকি হাসলো। ওর চোখও হাসছে। ওকে ভীষণ খুশি দেখাচ্ছে। মৃদুল কৌতুহলী গলায় বললো,
‘তাহলে পরীক্ষায় পাশ হয়েছি?’

‘হয়েছেন। সেদিন ভেবেছিলাম, পরে সত্যটুকু জানিয়ে দেব। কিন্তু এসে দেখি আপনি নেই। এভাবে কেউ পালিয়ে আসে?’

কপট অভিমান তিথির কণ্ঠে। মৃদুল বললো,

‘দেহটা নিয়েই তো পালিয়ে এসেছি। মন তো রেখে এসেছিলাম আপনার কাছেই।’

‘তাইতো ছুটে এসেছি। আমাকে আপনি ক্ষমা করে দেবেন।’

‘কেনো?’

‘আপনার পরীক্ষা নিয়েছি বলে।’

‘না, এর জন্য কঠিন শাস্তি ও জরিমানা ঘোষণা করছি।’

‘কি শাস্তি ও জরিমানা!’

‘শাস্তি হচ্ছে আজই আমার মতো বাউন্ডুলেকে তোমাকে বিয়ে করতে হবে।’

‘আর জরিমানা?’

‘আমি যখন নিরুদ্দেশ হবো তখন সঙ্গে থাকতে হবে। রাজি?’

‘রাজি।’

খিলখিল করে হেসে ওঠলো ওরা দু’জন।

সানাইয়ের সুরটা এ সময় হঠাৎ বেড়ে গেল।

১৬ মার্চ, ২০০৫
নিউইয়র্ক